বিশ্বের হিন্দু এক হও

হিন্দু ম্যানিফেস্টো

স্বামী মৃগানন্দ

বিশ্বের হিন্দু এক হও

[হিন্দু ম্যানিফেস্টো]

স্বামী মৃগানন্দ

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন

যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২

Vishwer Hindu Ak Hao

By Swami Mrigananda

[HINDU MANIFESTO]

প্রকাশক ঃ

স্বামী আত্মস্বরূপানন্দ

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর

1, ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা-700032

ফোন ঃ 2412-0769, 9331017262, 9874715659

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ ৭ই শ্রাবণ, ১৪০২ (24 July, 1995)

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অভেদানন্দ জন্মতিথি (12 September, 2001)

তৃতীয় সংস্করণ ঃ সারদা জন্মতিথি (24 December, 2013)

চতুর্থ সংস্করণ ঃ অক্ষয় তৃতীয়া (9 May, 2016)

অক্ষরবিন্যাস, প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণে

সিটি গ্রাফিক্স

18এ, ডাঃ ধীরেন সেন সরণী

কলকাতা-700006

ফোন ঃ 9330981277

প্রণামী ঃ তিরিশ টাকা মাত্র (Rs. 30/-)

শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের আশীর্বাণী

।। মহান হিন্দু ঐক্য স্বাগত ।।

সারা বিশ্বের মহান হিন্দু সংঘবদ্ধ হও
কোনো আগ্রাসী বিদেশী শক্তি
রুখতে যেন না পারে
তোমার অগ্রগতি
ভাঙতে না পারে নিষ্ঠায় দৃঢ়
তোমার ঐক্যনীতি।

দেশমাতৃকা বিশ্বজননী এক হয়ে শোনো ডাকে
তাঁহার রচিত উদার কর্ম্মক্ষেত্রে
বিশ্বছড়ানো কাজ প'ড়ে আছে, থেকোনাকো বসে আর
এসে যোগ দাও সে মহা যজ্ঞসুত্রে

হিন্দুর প্রাণে এক হয়ে আছে হরিহর একরূপে
হিন্দু রক্তে শক্তি যোগায় বৈষ্ণবী মহাদুর্গা
শক্তিবাহিনী বুকে।
আত্মকলহে মগ্ন থেকো না আর
লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণে লক্ষ দেবতা দেবী
বহু রূপ মাঝে এক হতে চায় ভূমার শান্ত ছবি
ঐ শোন তার মন্ত্রের ঝংকার।

সংঘবদ্ধ হও হে হিন্দু সংঘবদ্ধ হও
টুকরো টুকরো হতে দিওনাকো
ভারতের মানচিত্র
হাতে হাত ধ'রে গ'ড়ে তোলো এক বজ্রের বন্ধনী
কলনাদে ছুটে আসুক সেথায় সপ্তসিন্ধু তীর্থ।

বল হে সগৌরবে
বীর বিবেকের কণ্ঠের সাথে মিলায়ে কণ্ঠতান
সারা বিশ্বের হিন্দু আমরা, আমরা চির মহান
সর্ব যুগের যুগাবতারের করুণার ধারাস্রোতে
যুগে যুগে মোরা করি যে নিত্য স্নান।

শ্রীঅর্চনাপুরী মা।

এই বইটির বিষয়ে /পবিত্রকুমর ঘোষ

বেদমূর্তি সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বানে ঝঙ্কৃত এই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি। এই বইয়ে স্বামীজী সমগ্র বিশ্বের হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে ঋষির দিব্যকণ্ঠে। কিন্তু তা যেন উৎসারিত হয়েছে যুগের মর্মদেশ ভেদ করে।

স্বামীজি বলেছেন, তিনি কোনও আন্দোলনের স্লোগান দিচ্ছেন না, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যজাত আবেদনও জানাচ্ছেন না। হিন্দুসমাজের অগণিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ভেদরেখা। আমরা এক হয়েও যেন পরস্পর থেকে আলাদা। এই গণ্ডী ভেঙে আমাদের সম্মিলিত আত্মপ্রসারের জন্য এগিয়ে যাবার ডাক দিয়েছেন স্বামীজি।

হিন্দুসমাজ চিরকালই বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এটা দোষ না হয়ে গুণ, লজ্জার না হয়ে গৌরবের। অন্যান্য ধর্ম গড়ে উঠেছে একজনমাত্র প্রবর্তক ও তাঁর মুখের কথাকে ঘিরে। কিন্তু প্রবর্তক গত হলে এরকম প্রতিটি ধর্মই নানা সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়, শাখা, উপশাখা ও গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোনও একেশ্বরবাদী ধর্মও এই পরিণাম এড়াতে পারেনি। এমন কি, অভারতীয় একেশ্বরবাদী ধর্মের বিভিন্ন শাখা, দল ও উপদল নিজেদের মধ্যে শত শত বছর ধরে দাঙ্গা, খুনোখুনি ও রক্তপাতে লিপ্ত রয়েছে। হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পর্কের এতটা অবনতি কোনও দিন হয়নি।

তার একটি কারণ, হিন্দুধর্ম পরমতসহিষ্ণু। হিন্দুধর্মের প্রতিটি

সম্প্রদায়ও তা-ই। তারা নিজ নিজ মত ও পথের শ্রেষ্ঠতা দেখানোর জন্য তর্ক করে, শাস্ত্রবিচার আনে, যুক্তিজাল বোনে। কিন্তু শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী, প্রতিমাপূজক, বিশুদ্ধ ওঁ মন্ত্রের উপাসক কেউই একে অপরের গলা টিপে ধরে না। হাজার হাজার বছর ধরে এইসব সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করছে, নিজ নিজ শাস্ত্র ও গুরুনির্দেশিত মার্গ অনুসরণ করে সাধনভজন করছে, ইষ্টসেবা করছে, নিজেদের মত সমাজে প্রচার করছে। তারা কেউ কাউকে বাধা দেয় না, একে অপরের স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার ও সুযোগ কেড়ে নেয় না।

সহিষ্ণুতা ছাড়াও এর আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হল, তারা জানে, তাদের সম্প্রদায়গত মত ও পথ যত ভিন্নই হোক না কেন, এক অদ্বিতীয় মূল থেকে তারা কেউই ছিন্ন নয়। ভারতে উদ্ভূত সব ধর্মমার্গের—বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ অনুশাসন, আচারনিষ্ঠা, মান্যতা, ইষ্ট, শাস্ত্র, প্রবক্তা, গুরু এবং আচার্য। কিন্তু সব মত ও পথেরই লক্ষ্যবস্তু ঈশ্বরলাভ, ব্রহ্মোপলব্ধি, নিজেকে জানা, পরম সত্যকে অনুভব করা। মোক্ষ, নির্বাণ, ভগবানকে পাওয়া ও ভালবাসা। ভারতে জাত সব ধর্মেরই অন্তিম চাওয়া এই। তাই বাইরের বৈচিত্র্যের ভিতর নিবিড় দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের মধ্যেও রয়েছে গভীর মিল।

সেই মিলের গোড়ার কথাটি হল ত্যাগ। ভারতে উদ্ভুত কোনও ধর্ম ভোগবাদ প্রচার করেনি। তারা প্রত্যেকেই চার্বাকপন্থাকে ধিক্কার দিয়েছে। প্রত্যেকে বলেছে, নরনারীর ধর্মজীবন একমাত্র ত্যাগের ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্যই বিদেশ থেকে আসা ধর্মনামধারী,

ত্রাসসৃষ্টিকারী, হুঙ্কারবাদী মতবাদ এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের ওপর নিরন্তর আঘাত হেনে যাচ্ছে।

একদিকে ভারতের নিজস্ব উদার, সহিষ্ণু ও ত্যাগমন্ত্রযুক্ত ধর্ম, অন্যদিকে বিদেশাগত ভোগবাদমুখর, পরপীড়নকারী, সাম্রাজ্যবাদপন্থী মত। এ-দু'য়ের মধ্যে সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে। এই সংঘাত কয়েক শতাব্দী ধরে চললেও এর মাত্রা যেন এখনই সবচেয়ে বেশি। কেননা এতদিন হিন্দুধর্ম আক্রান্ত হলেও তার প্রাণপাখিতে হাত পড়েনি। মুসলিম শাসনকালেও না, ব্রিটিশ আমলেও না। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর সেক্যুলারবাদী শাসনতন্ত্র কায়েম হওয়ায় পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গিয়েছে।

সেক্যুলারিজম কথাটির অর্থই হল ধর্মবর্জন, ধর্মসম্পর্কশূন্যতা। বাস্তব প্রয়োগের বেলা সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা, পর্যবসিত হয়েছে হিন্দুত্ববিরোধীতায় ও মুসলিম তোষণে। সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যেসব অধিকার দেওয়া হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের তা থেকে করা হয়েছে বঞ্চিত। সেক্যুলারিজম জিনিসটি শুধু হিন্দুর জন্য। মুসলমানের জন্য নয়, খ্রিস্টানের জন্যও নয়।

অতীতে কখনও হিন্দুসমাজ এমন বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়েনি। বিদেশি শাসনকালে ধর্মান্তরিত হতে প্ররোচনা দেওয়া হত, বাধ্যও করা হত। হিন্দুরা তার প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু কেউ কখনও ধর্মবর্জন করতে তাদের শেখায়নি। তারা বরাবরই জানে, ধর্মই সমাজের প্রাণ, জীবনের মর্মবস্তু। কিন্তু সেক্যুলারবাদী রাষ্ট্র হিন্দুকে ধর্মবর্জন করতে উৎসাহ দিচ্ছে। তার ফলে হিন্দুধর্মের প্রাণপাখির গায়েই এখন হাত পড়েছে।

এমন অবস্থা চলতে দিলে হিন্দুধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হিন্দুসমাজ চূর্ণ

হবে। এই পটভূমিতেই স্বামীজি হুঁশিয়ার করেছেন, অতীতে যেমন মুঘল, ব্রিটিশ ইত্যাদি রাজশক্তি হিন্দুদের মধ্যেকার বিভেদপ্রবণতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল, ভবিষ্যতেও কোনও শক্তিশালী জাতি আবার তা করতে পারে। তাই জাতীয় স্বার্থে সহজ সত্য এখন আমাদের সহজ করেই বলতে হবে। সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে হিন্দুদের আত্মপরিচয়ের গৌরব।

তার বদলে এখন ভারতে চলছে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে হিন্দু ঐক্যভাবনাকে প্রতিহত করার প্রয়াস। এর পরিণাম হবে হিন্দুজাতির সমূহ বিনাশ। হয়তো ইতিমধ্যেই আমরা সেই বিনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি।

স্বামীজি বলেছেন, হিন্দুর আত্মপরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিহীন গণ্ডী বর্তমান তা ভেঙে দিতে হবে ভালবাসার প্লাবনে। পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে আপন করে নিতে হবে। পরস্পরের মন ও হৃদয়কে বুঝতে হবে, পরস্পরের আবেগ ও অনুভূতিকে মর্যাদা দিতে হবে, বুঝতে হবে পরস্পরের প্রয়োজনের দিকগুলি। শ্রীশ্রীঅর্চনা মার বাণী ঃ "অপরের গুণকে বড় করে দেখাটাও একটা মস্ত বড় গুণ। সকলকে বড় করলেই তো নিজেও বড় হয়ে যাবে।" হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোকদের এই বাণীটি সবসময় মনে রাখতে হবে।

হিন্দুদের এক সম্প্রদায়ের মানুষ যদি অপর সম্প্রদায়ের মানুষের গুণাবলীকে বড় করে দেখে ও ওই মনোভাবের প্রকাশ ব্যাপকভাবে হতে থাকে তবে সমাজের পট পরিবর্তন পলকে ঘটে যাবে। কেননা তাতে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌমনস্য সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক হিন্দু সম্প্রদায়

নিজের সার্বভৌমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য পুরো বজায় রেখেও অপরের সঙ্গে মনের মিল করে ও হাত মিলিয়ে নিত্য মিলনভূমি রচনা করতে পারে।

এই প্রসঙ্গেই ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দের একটি মহাবাণী বার বার স্মরণ করা দরকার। পঞ্চাশ বছর আগে তিনি বলেছিলেন, "সাধু গৃহী প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে, সংঘই শক্তি। কাজেই সংঘশক্তি বৃদ্ধি করা সব ধর্মপথের পথিকদের কর্তব্য। আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ সংঘের প্রতি প্রীতিযুক্ত হতে হবে। ধর্মকে মহনীয় ও শক্তিমান করে তুলতে হবে। ধর্ম শুধু নিজের জন্য নয়। ধর্মাচরণ বিশ্বযজ্ঞের প্রয়োজনেও সাধিত হওয়া উচিত। আজ উপনিষদের 'সহনাববতু'-র কথা ভাববার দিন এসেছে। প্রতি ধর্মসংঘকে অন্য সংঘগুলির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে— ধর্মে ইউ.এন.ও. গড়ে তুলতে হবে।"

এই ইউ. এন. ও. বা মহাসংঘ হবে সব হিন্দু ধর্মসংঘের মিলিত মঞ্চ। এর কণ্ঠস্বর হবে সমগ্র হিন্দুসমাজের মিলিত কণ্ঠস্বর। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি তাতেই সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় হবে। কেননা ভারতে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম আবহমানকাল ধরেই হিন্দুধর্মাশ্রয়ী। সমগ্র হিন্দুসমাজের সম্মিলিত ঐক্যরূপ ছাড়া এই দেশের মূল সত্তার উপলব্ধি সম্ভব নয়। আর, দেশের মৌলিক সমগ্রতার নিটোল রূপকে না বুঝলে দেশপ্রেমের ভিত্তিই হয়ে যাবে দুর্বল।

স্বামীজি এভাবে যুগের প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে তিনি দিয়েছেন একান্ত অনিবার্য কর্তব্যপথের বহুমুখী নির্দেশ।

স্বামীজি এই প্রসঙ্গে কিছু দীর্ঘমেয়াদী গঠনমূলক প্রকল্পের কথাও বলেছেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতির সামগ্রিক বিকাশের

দিক্‌নির্দেশ। হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনপ্রণালীকে তার স্বকীয় ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত করার কর্মপন্থা বলেছেন স্বামীজি। প্রাচীন মূল্যবোধের ও নবীন আবিষ্কারের মধ্যে সেতুবন্ধ নির্মাণ করাও এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য।

এই প্রকল্পগুলির কথা মনে রেখেই শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সব প্রকল্পের সম্মিলিত, সামগ্রিক ও বাস্তব রূপ এই মহাপীঠে মিলবে। শ্রীসত্যানন্দ মানসকন্যা পরম পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী শ্রীঅর্চনাপুরী মা এবং তাঁর ত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ সেই মহাপীঠের জন্য সুদীর্ঘ দিন তপস্যা করে চলেছেন। ভগবৎ কৃপায় তাঁদের তপস্যা সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশা রাখি। এই বইয়ে স্বামীজি যা বলেছেন তার মর্মার্থও তখন জনসাধারণের কাছে যথার্থভাবে প্রকাশিত হবে। কারণ, তখন তারা দেখতে পাবে গঠনমূলক কর্মপ্রকল্পের আদর্শ রূপায়ণ।

এই ছোট্ট পুস্তিকা হিন্দুসমাজকে সময়োপযোগী প্রেরণা জোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই পুস্তিকা হিন্দু সমাজের ম্যানিফেস্টো বলে আমি মনে করি।

গাঙ্গুলীবাগান
কলকাতা

পবিত্রকুমার ঘোষ

বিশ্বের হিন্দু এক হও

আহ্বান

'বিশ্বের হিন্দু এক হও'—পৃথিবীর সকল হিন্দুর কাছে এক নগণ্য হিন্দু সন্ন্যাসীর এই আবেদন। কোনও আন্দোলনের স্লোগান নয়, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আবেদন নয়। শুধু লক্ষ লক্ষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে প্রসারতার দিকে অগ্রসর হবার জন্য সস্নেহ আহ্বান।

মতুয়ার বুদ্ধি বা সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ধ্যানধারণা হিন্দু নামে পরিচিত এই মহাজাতিকে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছে। বিভক্ত থাকার ফলে দুর্বল হয়েছে জাতীয়তা, বিপন্ন হয়েছে আত্মপরিচয়, এমনকি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে সমগ্র হিন্দুসমাজ। আধ্যাত্মিক জগতে ঐক্যভূমি নির্মাণ ব্যতীত হিন্দুগণ উপলব্ধি করতে পারবে না পূর্ণতার আনন্দ, ভূমার আনন্দ, নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আনন্দ। যে জাতির আত্মপরিচয়, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বই বিপন্ন, তার অন্তরে পরমানন্দ স্ফূর্ত হবে কেমন ক'রে, কেমন ক'রে সে বিশ্ববাসীকে দেখাবে শাশ্বত শান্তির পথ?

আর্যজনোচিত সমুন্নত দিব্যজীবন লাভ ক'রে, সেই দিব্যজীবনের পথ বিশ্ববাসীকে দেখাবার জন্য হিন্দুজাতিকে উঠে দাঁড়াতে হবে আত্মপ্রত্যয়ের শক্ত মাটিতে। পরস্পর কলহে রত, গণ্ডীতে আবদ্ধ জীবন নিশ্চয়ই হিন্দুর পক্ষে মহনীয় নয়, বরণীয় নয়। পরন্তু পরস্পরের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা, সহানুভূতিযুক্ত ধর্মনিষ্ঠ জীবন, উদারতার সঙ্গে সংহতির প্রকাশ এবং নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সঙ্গে স্বদেশ-স্বজাতির অস্তিত্বকে এক ক'রে অনুভব করা, নিশ্চয়ই হিন্দুর পক্ষে মহনীয় ও বরণীয়। তাই এক নগণ্য

হিন্দুর ব্যথা ভরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠেছে এই সাদর আহ্বান—'বিশ্বের হিন্দু এক হও'।

হিন্দুধর্ম্মের সব মতপথের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরলাভ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, ঈশ্বর কিংবা আদ্যাশক্তিস্বরূপা চিন্ময়ী জননী সবই সেই ভূমার স্বরূপ। এই ভূমাই পরম আনন্দ। এর কমে পূর্ণানন্দ নেই। 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'—ঋষিদের শাশ্বত বাণী। শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ বললেন—"পশুদের সিদ্ধি বর্তমানকে নিয়ে, মানবের সিদ্ধি বর্তমানকে অতিক্রম ক'রে, অতিমানবের দৃষ্টি অতি প্রসারিত, ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টি-সিদ্ধি ভূমাতে, অ-সীমাতে। তাই প্রসারতা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়'।

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন এই প্রসারতার চরম অবস্থা। বলেছিলেন—'হরি ভাই, ঈশ্বরলাভ বলতে কী বুঝায় জানি না, তবে আমার বুকটা বড় হয়ে গেছে। সারা বিশ্বকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।' সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে না উঠলে এ অবস্থা হয় না, আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্ত গণ্ডী না ভাঙলে এই উদারতা আসে না, সর্বভূতে বাসুদেব দর্শন না হ'লে এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয় না। 'বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'।

দাতার ভূমিকায় হিন্দু

হিন্দুদের ভূমিকা দাতার ভূমিকা, ভিক্ষুকের ভূমিকা নয়। হিন্দুরা জানে ধর্মদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। হিন্দুদের ধর্মসম্পদ জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, যার মূল্যায়নে পাশ্চাত্ত্য অসমর্থ। কিন্তু হিন্দু আজ তার সেই মহান দাতার ভূমিকা থেকে সরে এসে কেন কাঙালের পংক্তিতে দাঁড়াল, সেকথাটাই ভাববার কথা। আসলে এ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হিন্দুরা নিজেরাই। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে, স্বধর্মনিষ্ঠা হারিয়ে, হিন্দু হয়ে হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি

হারিয়ে, জাতীয় চেতনা হারিয়ে, নিজেদের সব কিছুকে ঘৃণা করতে শিখেছে হিন্দুরা। ক্রীতদাসত্বের মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে স্বজাতির এবং স্বদেশের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হয়েছে হিন্দুরা। অতএব শ্রেষ্ঠ দাতার সেই বৃহত্তর মহত্তর ভূমিকা কে পালন করবে? কোথা হতে আসবে সেই সামর্থ্য। সব থাকতে যেন দেউলিয়া হয়ে ঘুরছে একটা মহান জাতি। আর এই দয়নীয় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে বিদেশী বিধর্মীর দল।

এর প্রতিকার একটাই—ক্রীতদাসত্ব ঘুচিয়ে সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়ানো। এর জন্যই প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের হিন্দুর মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। ইংরাজিতে একটা কথা প্রচলিত আছে— United we stand, divided we fall. ঐক্যবদ্ধ হলেই আমরা উঠে দাঁড়াব, বিভক্ত বিচ্ছিন্ন থাকলে অবনতই থেকে যাব। একটা সরু সূতোকে পট ক'রে ছিঁড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু অজস্র সূতো একত্রে পাকিয়ে মোটা দড়ি তৈরি করলে তাকে ছেঁড়া সুকঠিন হয়ে পড়ে। একটা সরু কাঠিকে ভেঙে দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু অনেকগুলি সরু কাঠিকে একত্রিত ক'রে শক্ত আঁটি তৈরি করলে সেটাকে ভাঙা কঠিন হয়ে পড়ে। সবাই জানে এই সহজ কথা, কিন্তু কাজে প্রয়োগ করে না—এইটাই তো বিড়ম্বনা। এই ঐক্যবন্ধন নির্মাণের জন্যই প্রয়োজন স্বধর্মের প্রতি প্রাণাধিক অনুরাগ। তবেই স্বধর্মের জন্য প্রাণপণ করবার তাগিদ অনুভূত হবে অন্তরে।

প্রকৃত হিন্দু কে?

হিন্দু পরিচয়ের গৌরব উপলব্ধি করতে হবে হিন্দুদের এবং হিন্দুমাত্রের প্রতি অনুভব করতে হবে গভীর সহানুভূতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে। তখন—কেবল

তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষী হিন্দু নামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দু নামধারী যে-কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে, আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে।" হিন্দুদের জীবনে বিবেকানন্দের এই বাণীর যথার্থ প্রতিফলন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য সব উদারতার বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভান, আসলে উদারতার নামে প্রবঞ্চনা মাত্র। কারণ, যার নিজের লোকের সঙ্গে অতি আপনার স্বজাতির সঙ্গে মিল নেই, ঐক্য নেই, বরং অকারণ বৈরতা রয়েছে, ঈর্ষা রয়েছে, সে বিধর্মী বিজাতীয় লোকের সঙ্গে কী ক'রে একত্বের বন্ধনে মিলিত হবে, বোঝা দায়।

সেক্যুলারিজ্‌মের প্রভাবে সমাজের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, তা একজন হিন্দুচেতনাযুক্ত জৈন সম্প্রদায়ের এ্যাডভোকেট মহোদয় একটি ছোট্ট কথায় বলেছেন। তিনি বলেন—'আজকাল কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভাবতে হয়, মানুষটা হিন্দু তো বটে, কিন্তু হিন্দু মনোভাবাপন্ন বা Hindu-minded বটে তো? দেখছি, নামে হিন্দু আছে কিন্তু মনটা হিন্দুর নয়, মনটা ইস্‌লাম, খ্রীষ্টান কিংবা সেক্যুলার। এ অবস্থা খুবই প্রকট। এখন হিন্দু হয়ে হিন্দুর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না। আগে তার সম্বন্ধে জানতে হয়, তার মনোভাব কী? কত বড় মুস্কিল ভেবে দেখুন।' সবচেয়ে বিড়ম্বনা, এই নামে হিন্দু, কাজে অহিন্দুরাই বিধর্মীর প্রতি উদারতা দেখাতে অকৃপণ, কিন্তু স্বজাতির প্রতি অতি নির্মম।

হিন্দুরা বলে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে—'বসুধৈব কুটুম্বকম্', অথচ হিন্দু ভাইটির সঙ্গে পাতাতে পারে না অন্তরের কুটুম্বিতা। একদল বলে—

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'-র মতো উদার শাস্ত্রবাক্য, অথচ কার্যক্ষেত্রে তাদের আচরণে ও কর্মে বুঝিয়ে দেয় একমাত্র তার গোষ্ঠীটুকুই সৎ, বাকি সব অসৎ। একদল বলে, তাদের উদার দর্শনের 'স্যাৎবাদ', 'অনেকান্তবাদ' ইত্যাদির কথা, অথচ কার্যক্ষেত্রে নিজস্ব মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ ছাড়া অন্য কোনও দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করে না। এরকম তো অনেক অনেক উদাহরণ রয়েছেই হিন্দু সমাজে। অতএব, কথায় ও কাজে চাই মিল।

অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষের দ্রষ্টা ঋষিবৃন্দ ও অবতার মহাপুরুষবৃন্দ বহু ধর্মমার্গের প্রবর্তন করেছেন ভগবৎলাভের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। এই সব ধর্মপথ এক একটি বিশেষত্ব ও নাম নিয়ে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় মূল থেকে কেউ ছিন্ন নয়। তাই হিন্দুধর্মে মত, সম্প্রদায় ও ধর্ম একার্থবাচক। কারণ, মত বললেই বুঝায় ধর্মমত বা ধর্মমার্গ, আর সেই মত বা পথের অনুগামীবৃন্দকে নিয়ে গড়ে ওঠে সম্প্রদায়। এই নানা মত, নানা সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই এমন পরিপূর্ণ ধর্ম যা প্রতিষ্ঠাতা নিরপেক্ষরূপেও বিদ্যমান। যদিও সিদ্ধমহাপুরুষদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে ওঠে বিশেষ মত। এগুলি সেমেটিক ধর্মমতের মতো কোনও ব্যক্তি সাপেক্ষ বা প্রফেট নির্ভর নয়। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে মানবকে মানবত্বে ধারণক্ষম প্রকৃত ধর্মের শাশ্বত তত্ত্বই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আধারে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই সামগ্রিক রূপে এই মৌলিক ঐক্যযুক্ত বৈচিত্রময়তার প্রকাশকে বলা হয় হিন্দুধর্ম, হিন্দুসংস্কৃতি, হিন্দুজাতি কিংবা হিন্দুসভ্যতা।

তাই হিন্দু কথাটি অতি ব্যাপক, অসাম্প্রদায়িক ও বহু অর্থব্যঞ্জক। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যযুক্ত ভারতোদ্ভুত যে কোনও একটি ধর্মমার্গই হিন্দুধর্ম। এই সব বিভিন্ন ধর্মমার্গের রয়েছে নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ অনুশাসন,

আচারনিষ্ঠা, মান্যতা, ইষ্ট, শাস্ত্র, প্রবক্তা, গুরু, আচার্য। সব মিলিয়ে এক একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাজ্য। অর্থাৎ হিন্দু শব্দে যেমন একটি বিশেষ ধর্মপথও বোঝায়, তেমনি বহু ধর্মপথের সমষ্টিরূপও একই সঙ্গে বোঝায়। ঐসব ধর্মমূল থেকে প্রবাহিত যে অনন্ত সংস্কৃতির ধারা তা হিন্দু সংস্কৃতি নামে পরিচিত। আর ঐসব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবর্তক, ধারক ও বাহকগণ হিন্দুজাতি নামে অভিহিত ও পরিচিত। তাই হিন্দু বলতে সনাতন, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৈদিক, বৈদান্তিক, সৌর, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী, এমন কি বনবাসী, গিরিবাসী এবং তথাকথিত অন্ত্যজ, দলিত প্রভৃতি অসংখ্য সমভাবাপন্ন মতাদর্শের মানবকুলকে বোঝায়। হিন্দু শব্দের প্রয়োগ এই উদার সর্বগ্রাহী অর্থেই করা হয় এবং করা উচিত।

'হিন্দু' সাম্প্রদায়িক শব্দ নয়। হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক শব্দ বা সংকীর্ণ অর্থবাহী শব্দ মনে করা নিতান্তই ভুল এবং অবাঞ্ছনীয়। আজ সারা বিশ্ব এই শব্দটির দ্বারা ঐ বহুব্যঞ্জনাময় প্রকৃত অর্থই বোঝে। সারা বিশ্ব যে শব্দ উচ্চারণমাত্র এই মহান জাতির সামগ্রিকতাকেই বোঝে, সে শব্দকে নিয়ে বৃথা তর্কের-জন্য-তর্ক নিতান্তই সময় ও শক্তির অপচয়।

হিন্দু শব্দের সঙ্গে চাই হিন্দুত্বের আদর্শ

এখন হিন্দুদের হাতে তর্কের খাতিরে তর্ক করে যাওয়ার সময় নেই। এখন সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে একজোট হয়ে, সংযত হয়ে, সংহত হয়ে কাজ করার সময়। নিজেদেরে মধ্যে তর্কবিতর্ক বুদ্ধির সূক্ষ্ম কূটকচালি পরেও করা যেতে পারে, আর না করলেও কিছু যায় আসে না। কারণ, মুখ্য উদ্দেশ্যটাকেই এখন ধ্রুবতারা করা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্য হিন্দুর নিটোল ঐক্যরূপ প্রতিষ্ঠা। হিন্দু শব্দে একাধারে যা কিছু বোঝায় তা বোঝাবার মতো অন্য বিকল্প শব্দ নেই।

আমরা তাই বাস্তবকে সামনে রেখে 'হিন্দু' শব্দকেই আমাদের সামগ্রিক জাতীয় পরিচয়মূলক শব্দরূপে গ্রহণ করেছি।

কিন্তু শুধু শব্দকে গ্রহণ করলে তো হবে না। শুধু 'আমি হিন্দু' 'আমি হিন্দু' বলে তারস্বরে চিৎকার করলেই কি আমার হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে? হিন্দুত্বের সব গুণ আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যাবে? হিন্দুত্বের মহিমা হিন্দুত্বের গৌরব সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে? না, শুধু নামে হবে না। চাই নামের সঙ্গে গুণের সমন্বয়।

ভারতবর্ষের দৃষ্টি চিরকাল বস্তুগত গুণমানের দিকে। এখানে মূল্যায়ন শুধু মোড়ক বা লেবেল দেখে হয় না। অতএব যথার্থ হিন্দুত্বের গুণাবলীকে আয়ত্ব করা এবং জীবনচর্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করা, হিন্দু ঐক্যভাবনার একটি প্রধান ও পূর্ব শর্ত। সত্যিকার স্বধর্মনিষ্ঠা না থাকলে দাঁড়ানোর কোনো জমিই থাকে না পায়ের নীচে। স্বধর্ম-নিষ্ঠার শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়েই সমন্বয়ী দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় অপরাপর ধর্মমত বা ভগবৎ পথের প্রতি। জীবনে স্বধর্ম-নিষ্ঠাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে উদারতার স্লোগান দেওয়া পরিণামে ক্ষতিকর হতে বাধ্য।

শুধু নামে যেমন হবে না, তেমনি নামকে বাদ দিয়েও হবে না, একথাও আজ বুঝতে হবে প্রত্যেক হিন্দুকে। হিন্দু বলতে বা হিন্দু বলে নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা কিসের? কেন এসেছে অকারণের এই হীনমন্যতা? কেন আমরা অকারণের মিথ্যা আরোপকে সত্য বলে মেনে নেব? হিন্দু বললে সাম্প্রদায়িক হয়—বলেছেন রাজনীতির কিছু স্বার্থপর লোক। তাই সেটা মেনে নিতে হবে অকাট্য সত্য বলে? হিন্দু বললে কি সংকীর্ণ গণ্ডীযুক্ত একটি সম্প্রদায় বোঝায় যার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ঐ গণ্ডীতেই সীমিত? হিন্দু বললেই কি মানবতার উদার ধারণা ব্যাহত হয়? কিছু

লোক অবশ্য এ ধরণের অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রচার ক'রে চলেছে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য। তাই বলে বিবেকবুদ্ধিকে চাবি দিয়ে আটকে রেখে নির্বিচারে মেনে নিতে হবে এসব ভিত্তিহীন অযৌক্তিক কথা? এ কী ধরণের যুক্তিবাদী সমাজ? যারা এ সব কথা বলছে এবং মেনে নিচ্ছে তারা কী ধরণের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়? এসব একটু নিরপেক্ষ স্থানে দাঁড়িয়ে নিঃস্বার্থ চিত্তে ভাবতে হবে সমগ্র হিন্দু সমাজকে।

হিন্দু শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি

হিন্দু শব্দ পবিত্র উদার মানবতাবাচক শব্দ। হিন্দু শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি উদার সহিষ্ণু জাতির বহু বিচিত্রতার মধ্যে সামগ্রিক ঐক্যবিধানের শক্তি। হিন্দু এই একটি শব্দে রয়েছে সমভাবাপন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি যুক্ত অথচ বহুধাবিভক্ত এই প্রাচীনতম সভ্য আর্যজাতির মধ্যে মিলনের হাওয়া বইয়ে দেবার সামর্থ্য। এই একটি শব্দে প্রকাশিত হয় কালপ্রবাহে অম্লান বৈচিত্র্যময় সুন্দর একটি জাতির প্রবহমান সভ্যতার সামূহিক পরিচয়।

কিন্তু বিভক্ত হিন্দুদের মধ্যে মিলনের হাওয়া বইলে, 'divide and rule' যাদের নীতি, সেই বিদেশী প্রভুরা চটতে পারেন, তাঁদের পারিষদরা চটতে পারেন, কিংবা হিন্দুবিদ্বেষী দেশীরা চটতে পারেন কিংবা নিহিত স্বার্থযুক্ত ক্ষমতাবান কিছু মানুষ চটতে পারেন, এই কারণেই কি হিন্দু শব্দ বর্জনীয়? এই কারণেই কি হিন্দু শব্দকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে সর্বত্র?

এটা বিশেষ ভাবেই ভাববার বিষয়। তাই যদি হয় এবং তা যদি আংশিকভাবেও সত্য হয়, তাহলে বলতেই হবে—It is high time, আর নয়। সময়ের ঘণ্টা বেজেছে। হিন্দু শব্দকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে এখনই আমাদের দিতে হবে এর উচিত প্রত্যুত্তর। কারণ, নিহিত-স্বার্থযুক্ত

প্রভুরা কী বলবেন, এই ভেবে এবং এই ভয়ে ওঠা বসা ক্রীতদাসসুলভ মনোভাবেরই পরিচায়ক। এরকম চলতে থাকলে মহতী বিনষ্টির আশঙ্কাই হবে স্বাভাবিক।

হাজার বছরের পরাধীনতার কারণ ও পরিণাম

প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। অনেকে মনে করেন, divide and rule ব্রিটিশেরই নীতি, যার উদ্দেশ্য হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিভেদ বজায় রেখে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করা। এই ভিত্তিতেই হয়েছে দেশভাগ। পাকিস্তান হয়েছে ইসলামিক রাষ্ট্র অথচ ভারতবর্ষ হয়েছে সেক্যুলার। এসবেরও গোড়ার কথা ভারতবর্ষে আরও বহু শতাব্দী পূর্বে মুঘল রাজত্ব কায়েম হওয়া। এরও পটভূমি লক্ষণীয়।

তখন হিন্দুসমাজ ছিল নিজেদের মধ্যে হিংসাপরায়ণতায় বিচ্ছিন্ন এবং বহু বিভেদে দুর্বল। নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র স্বার্থসর্বস্ব অহংকারের দেওয়াল, যা জাতির সমগ্রতাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে রেখেছিল। কোটি কোটি দরিদ্র অশিক্ষিত লাঞ্ছিত শোষিত উপেক্ষিত মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ সামনে দেখেছে শুধু অন্ধকার। তাদের আত্মসম্মান নেই, তেজ নেই, মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় নেই, এমনকি আগ্রহও নেই। তারা যেন জীবন্ত জড়পিণ্ড। রাজনীতির অনুশাসন, ধর্মের নামে সমাজের অনুশাসন, সর্বত্র স্বার্থান্ধতা, ক্ষুদ্রতা, বিভেদজীর্ণতা। একটা ছন্নছাড়া ছবি। স্বদেশের সুরক্ষা এমন কি আত্মরক্ষার কথাও গুরুত্ব সহকারে ভাবা হয় নি।

অতএব এই বিভেদ-দীর্ণ হিন্দুজাতির ওপর আধিপত্য যে ভাবেই হোক সম্ভব হয়েছে মুসলিম আক্রমণকারীদের পক্ষে। তারা নিয়ে এসেছিল ইসলামের শাসন। খৃষ্টান ধর্মের শাসন নিয়ে এসে ব্রিটিশ যেমন এই মহাভারতের হিন্দুদের সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে যায় নি, তেমনি তারও

আগে ইসলাম ধর্মের শাসন নিয়ে আসা মুস্‌লিমরাও মহাভারতের হিন্দুদের সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে যায়নি। বহিরাগত এই উভয় শাসকদলই নিজ নিজ স্বকীয় আলাদা অস্তিত্ব এবং আত্মপরিচয় বা identity অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দুদেরই করেছিল বহুলাংশে ধর্মান্তরিত। এই বাস্তব ইতিহাসকে মনে রেখেই হিন্দু সমাজকে এগোতে হবে আত্মসমীক্ষার পথে প্রকৃত জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা দু'শ বছরের নয়, হাজার বছরের। সেই মর্মভেদী ইতিহাসের কথা ভুললে বা অস্বীকার করলে, কিংবা তথ্যকে বিকৃত করলে হিন্দুদের অবস্থাটা চিরকালই থেকে যাবে, 'from frying pan to fire and fire to frying pan'—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার মারাত্মক ফল হবে দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জাতীয়ত্বেরই বিলুপ্তি, তাই এ বিষয়ে হতে হবে সাবধান।

হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা জনিত দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছে মুঘল, তুর্কী, বৃটিশ, পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতিরা। তেমনি যে কোনও শক্তিশালী জাতিই আজ অথবা যে কোনও সময় ঐ রকম সুযোগ পেলে তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারে। এই আশঙ্কার জন্যই প্রতিমুহূর্তের প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং তার জন্য চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ।

যে কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজনৈতিক তৎপরতা এবং সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চয়ই অনিবার্য প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার ঐতিহ্যবাহী এক বিশাল দেশের জাতীয়তা ও প্রকৃত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে শুধুমাত্র সীমান্ত সুরক্ষাই পর্যাপ্ত নয়। দেশের ভেতরেও যাতে কোনও রকম ফাটল না ধরে সে দিকেও সমান গুরুত্ব

দিতে হবে। দেশ যদি তার সীমার ভেতরেই বিভেদ বিচ্ছিন্নতার ফাটল রেখায় জর্জরিত হয়ে থাকে, তাহ'লে জাতীয়তা ও স্বাধীনতা ভেতর থেকেই হয়ে যাবে দুর্বল এবং টুকরো টুকরো। ধর্মে, সংস্কৃতিতে, জীবনচর্যায়, চিন্তায় ভাবনায়, শিক্ষায় দীক্ষায় এই মহান বিশাল স্বদেশের খণ্ড অঙ্গ ক্রমশঃ খণ্ডিত হয়ে হয়ে বিদেশ হয়ে গিয়েছে। এই বেদনাময় ইতিহাস আজও হিন্দুদের হৃদয়ে মাঝে মাঝে আলোড়ন তোলে বৈ কি! ভাবতে হবে আজও সেই ভয়ঙ্কর অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা থেকে সত্যিই মুক্ত হতে পেরেছে কি এই দেশ? যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই এখন জাতীয় স্বার্থে সহজ সত্যকে সহজ করেই বলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে হিন্দুদের আত্মপরিচয়ের গৌরবকে ফাটলহীন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পৃথিবীর সব জাতির সব দেশের আছে নিজস্ব ধর্মগত জাতিগত পরিচয়ের গৌরববোধ। সেটাকে আমরাই আবার ফলাও ক'রে বলি। তাহলে হিন্দুদের ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, জাতিগত, সুসভ্যতার ঐতিহ্যগত পরিচয়ের গৌরববোধ থাকলে সেটাই দোষের হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে, কী কারণে হিন্দু সেই সহজ স্বাভাবিক অধিকার থেকেও হবে বঞ্চিত? সবচেয়ে আশ্চর্য, হিন্দুনামধারী একশ্রেণীর মানুষ এই ধরণের অযৌক্তিক বৈষম্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, প্রচার করছেন বুক ফুলিয়ে। হিন্দুদের মাঝেই যখন রয়েছে এই শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব, তখন অপর জাতির লোককে কি কিছু বলার থাকে?

হিন্দুত্বের বিরাট সত্তা

হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত যে কোনও মতপথের প্রত্যেক মানুষকে আত্মপরিচয়ের গৌরব ব্যক্ত করতে হবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে। ধর্মীয় কিংবা

সাংস্কৃতিক, ভাষাগত কিংবা প্রাদেশিক, যত বিশেষত্বযুক্ত একক পরিচয় থাকুক না কেন, সেটা সামগ্রিক হিন্দু পরিচয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এটা অনুধাবন করতে হবে। একজন জৈন সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ; তেমনি একজন বৌদ্ধ কিংবা শিখ, বৈষ্ণব, কিংবা শাক্ত সমগ্র হিন্দুজাতিরই এক একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষভাবে লক্ষণীয়—জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ এবং আরও কোনও কোনও সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ 'হিন্দু' হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। তাঁরা যে বিরাট হিন্দুত্বের ও হিন্দু জাতিরই অঙ্গ একথা তাঁদের অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু এর বহিরঙ্গ কারণ যাই হোক না কেন, বস্তুতঃ এঁরা কেউই বিরাট হিন্দু সমাজ থেকে কোনওভাবেই পৃথক নন এবং কখনও হতেও পারেন না। এঁদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ও মূল শাস্ত্রসমূহ সবই হিন্দুদের শাশ্বত সনাতন ধারার সঙ্গে বস্তুগত ও তত্ত্বগতভাবে এক ও অভিন্ন। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ একটু শাস্ত্র মন্থন করলেই পাওয়া যায়। এইভাবেই ভারতে উদ্ভুত প্রত্যেক মত পথ ও সম্প্রদায় সামগ্রিক বিরাট সত্তার সঙ্গে একীভূত। সেই সত্তারই নাম হিন্দুত্ব।

হিন্দুত্ব নামক এই সত্তা অপৌরুষেয় সত্তা। তাই এর কোনও ব্যক্তিনির্ভর সংকীর্ণ গণ্ডী নেই। অনাদিকাল থেকে শ্রুতি পরম্পরায় প্রবহমান সর্ববিধ জ্ঞানের আকরস্বরূপ বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি হিন্দুদের গ্রন্থরাজিকে অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করা হয়। কারণ, এই সমস্ত অখণ্ড জ্ঞানরাশি কোনও পুরুষ-নির্ভর নয়। এগুলি স্বতঃ প্রকাশিত সত্য ও চিরন্তন তত্ত্বের সমষ্টি। যুগে যুগে অবতার মহাপুরুষগণ এই সকল স্বপ্রমাণ সত্যকে তাঁদের জীবনবেদের আলোকে পুনঃ প্রমাণ ক'রে যুগোপযোগী ধর্মানুশাসন দিয়ে যান। সেই একই সত্যকে দ্রষ্টা ঋষি

শ্রী বা বিপ্রগণ বহুধা বলে থাকেন। অতএব যত মতপথই থাক না কেন, যত মতপথই সৃষ্ট হোক না কেন, তাতে সমগ্র হিন্দুধর্মের অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয় না, বরং পরিপুষ্ট হয়।

হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক

অনেকে মনে করেন হিন্দুদের মধ্যে একটা নিটোল ঐক্য কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব এবং অসম্ভব কল্পনা। কারণ, যেখানে হাজার হাজার মতপথ, দেবদেবী, শাস্ত্রগ্রন্থ, অবতার, মহাপুরুষ, গুরু, আচার্য নিয়ে অন্তহীন কলহ বিভ্রান্তি বর্তমান, সেখানে ঐক্যকল্পনা অবাস্তব। কিন্তু এটা মোটেই ঠিক নয়। আসলে হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্যটাই আশ্চর্য্যজনক ও অবাস্তব। যাদের ধ্যানধারণা উপলব্ধি আবহমানকাল থেকেই মূলতঃ এক, তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়া ভাব, মিলেমিশে না থাকার প্রবণতা, বিচ্ছিন্নতার দেওয়াল, এসব সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। তত্ত্বতঃ এবং বস্তুতঃ, হিন্দুদের পক্ষে শতবৈচিত্র্য নিয়ে মিলেমিশে এক হয়ে থাকাই সহজ এবং স্বাভাবিক। যেহেতু সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড অন্তর্নিহিত ঐক্য বিদ্যমান, তাই কোথাও কোনও বিরোধ বা বিষমতার অবকাশ নেই। সাম্য সামঞ্জস্য ঐক্য ঐকতান হিন্দুধর্মে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতোই বিদ্যমান। একে শুধু আবিষ্কার ক'রে প্রত্যেক হিন্দুর উদার মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা। উদার প্রেম আর গভীর সহানুভূতি নিয়ে হিন্দুসমাজের কথা যদি সব সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ ভাবতে শুরু করেন, তাহলে হিন্দু ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে সব বাধা মুহূর্তের মধ্যে সরে যায়। হয়তো এটা আজ চোখে পড়ছে না। কিন্তু এই বিড়ম্বনাযুক্ত অস্বাভাবিকতাকে দূর করা কেন অসম্ভব হবে? কোন্ যুক্তিতে এটা অসম্ভব কল্পনা?

অযৌক্তিক অনৈক্যের কারণ

হ্যাঁ, যুক্তি বাদ দিয়ে দুটো তুচ্ছ কারণ আছে বটে। এক, অহং-ভাবের প্রভাব। দুই, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। অবশ্য এই বিষয়টাও একটু জটিল এবং স্পর্শকাতর (touchy)। তবু দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে একটু খতিয়ে দেখতেই হবে।

অহং-ভাব বলতে বোঝাচ্ছে সাম্প্রদায়িক স্বাভিমানের ছদ্মবেশে মতুয়ার বুদ্ধি। অথবা মঠ, আশ্রম সংঘ কিংবা সংগঠনের পদাধিকার বলে ক্ষমতার অভিমান; অথবা ব্যক্তিগত স্তরে নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্বের অভিমান। এক একটি ধর্মমত বা ধর্মপথের মধ্যে এবং তাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাগুলির মধ্যে institutionalisation-এর প্রবণতা এসে পড়ে এই কর্তৃত্বাভিমানবশতঃ। ইংরাজি শব্দটির অর্থ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিকতা। এই institutionalisation বা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিকতা তৈরি ক'রে নেয় বিচ্ছিন্নতার শক্ত উঁচু দেওয়াল। সে প্রাচীর ভেদ ক'রে তাদের সঙ্গে উন্মুক্ত হৃদয়ে সহজ অবারিত আদানপ্রদান করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ, প্রাচীর যারা তুলেছে তারা সেটা চায় না। এর সঙ্গে বস্তুগত বা তত্ত্বগত কোনও যুক্তির সম্পর্ক নেই। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের মাথাটা সবচেয়ে উপরে তুলে ধরার একটা প্রবণতা মানুষের থাকে। সেটা স্বাভাবিক, সাধারণ। কিন্তু যারা সমাজের বুকে, দেশের বুকে একটা মহান্ ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ, তাদের পক্ষে এই সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতা কি কখনও যুক্তিযুক্ত হতে পারে?

এই গণ্ডীবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার প্রবণতাকে নিবারণ করতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বহু মত পথের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন,

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে পাওয়াই যাদের উদ্দেশ্য সেরকম সব ধর্মমতই ঈশ্বরলাভের এক একটি পথ। আমার মতটাই ঠিক, আর সব ভুল, এটা মতুয়ার বুদ্ধি—এটা ঠিক নয়। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চিরবিদ্যমান ঐক্যসূত্রকেই তিনি পুনরাবিষ্কার ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিলেন হিন্দুধর্মেরই বিরাট প্রাঙ্গণে। উদারতার সঙ্গে স্বধর্মনিষ্ঠার ঘটালেন একটা অপূর্ব সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সাকার-নিরাকার সব একাকার হয়ে গেল তাঁর উদার উপলব্ধির সহজ অভিব্যক্তিতে। প্রোথিত হ'ল হিন্দুসংহতির বীজ।

অতএব যা সহজলভ্য, যা স্বাভাবিক তাকে অকারণ অবাস্তব কল্পনা বলে দূরে সরিয়ে রাখা শুধু এড়িয়ে যাওয়ার ছল। হিন্দুরা যদি ইচ্ছা করে তাহলেই সব ঘুচিয়ে তারা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারে হিন্দুত্বের ঐক্যরূপ।

হিন্দু সংহতির ভিত্তি রচনার সোপান

শ্রীঅর্চনা মা বলেছেন—"অপরের গুণকে বড় ক'রে দেখাটাও একটা মস্ত বড় গুণ। সকলকে বড় করলেই তো নিজেও বড় হয়ে যাবে। কারও কোনও গুণের কথা শুনে অনেকে সেটা কেটে দিয়ে বলে ওঠে—ওটা এমন কিছু নয়। কিন্তু এটা করা ঠিক নয়। যার যেটুকু ভালো গুণ দেখবে সেটাকেই বড় করবে, মর্যাদা দেবে।"

কিন্তু অপরকে বড় করার জন্য প্রয়োজন নিজের হৃদয়ের প্রসারতা। মান যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা কিংবা অন্যান্য বাসনা কামনার জন্যই আসে সংকীর্ণতা। তখন অপরকে বড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি সত্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। কারণ, প্রতিষ্ঠান তো ব্যক্তিগণই পরিচালনা করেন।

আবার সারদা মায়ের অপূর্ব নির্দেশ হচ্ছে—"কারও দোষ দেখো না, কারও নিন্দা কোরো না। পোকাটিরও না।" নিন্দাচর্চা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মতোই বলা যায়। অপরকে খাটো ক'রে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পরনিন্দা বা দোষদর্শনের পিছনে এই আত্মপ্রসাদ লাভের আকাঙক্ষাই প্রধানতঃ কাজ করে। অমুকের অমুকের এই সব খারাপ, এই সব নিন্দনীয় ইত্যাদি বলার মধ্যে উহ্য আছে—আমার মধ্যে ঐ সব নেই। অর্থাৎ ওরা খারাপ, আমি ভালো। এই স্বভাবটাও ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি সত্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। কারণ, ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তির গুণাগুণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

হিন্দু সংহতির ভিত্তিরচনার প্রয়োজনে শ্রীঅর্চনা মা ও শ্রীসারদা মার উপর্যুক্ত নির্দেশ একই সঙ্গে অবশ্য পালনীয়। হিন্দুদের এক সম্প্রদায়ের মানুষ যদি অপর সম্প্রদায়ের মানুষের গুণাবলীকে বড় ক'রে দেখে এবং বলে, তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যে পট পরিবর্তন হয়ে যায় গোটা সমাজের। অপরের নিন্দা ক'রে দোষদর্শন ক'রে আমরা তিক্ততার সৃষ্টি করি নিজেদের মধ্যে। ফলে সবাই সবাইকে খারাপ চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং বংশানুক্রমে সেই ভাব সংক্রামিত হ'তে থাকে হেরিডিটারি ডিজিজের মত, বংশগত রোগের মত। কিন্তু অপরের গুণাবলীকে বড় করলে, প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখলে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়, সৌমনস্যের সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘদিন এই ভাব সমাজে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে বংশপরম্পরায় স্নেহপ্রীতিযুক্ত মধুময় সমাজ গড়ে ওঠে।

ইষ্টনিষ্ঠার সঙ্গে উদার শ্রদ্ধার সমন্বয়

তাই হিন্দুদের এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলতে গিয়ে অপরকে খারাপ বলা। হিন্দুধর্মের মধ্যে যারাই আছে এবং যে

সম্প্রদায়ের যে ভাবই থাক না কেন, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিশ্চয়ই রাখতে পারে। তারা যদি বলে, আমি শ্রেষ্ঠ, আমার পথ শ্রেষ্ঠ, আমার ইষ্ট শ্রেষ্ঠ, তাহলে আপত্তির তো কিছু নেইই, এবং এটা উৎসাহের কথা। কারণ, ইষ্টনিষ্ঠা না থাকলে, নিজের নিজের ইষ্ট শাস্ত্র আচার অনুষ্ঠান অনুশাসন ইত্যাদির প্রতি একাগ্র বিশ্বাস না থাকলে, অধ্যাত্মপথে ইষ্টলাভ হবে না। একটা নির্দিষ্ট পথ ধরেই এগোতে হবে। একটা সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হবে। কিন্তু আপত্তির কথা উঠবে তখনই যখন একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান, অপর পথের পথিককে আমি বলে বসব পথভ্রান্ত। এটা বলার কোনও অধিকারও আমার নেই, আর কোনও যৌক্তিকতাও নেই এর পিছনে। কারণ, হিন্দুধর্মের সব মতপথ একই আত্যন্তিক মূলের সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকেই আসা, সেখানেই যাওয়া, মাঝে শুধু বৈচিত্র্যময়তা। বস্তুতঃ তারা এক। কাজেই একটিতে শ্রদ্ধা মানেই অপরগুলিতে শ্রদ্ধা। একই সঙ্গে একই বস্তুতে শ্রদ্ধা আর অশ্রদ্ধা দুই তো করা যায় না।

অতএব যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের মত পথ ইষ্ট বা সম্প্রদায়ের প্রতি নিষ্ঠা দেখাতে গিয়ে অপরের মত পথ ইষ্ট বা সম্প্রদায়কে খাটো করে, অশ্রদ্ধা করে, অবজ্ঞা করে, তার নিজের ইষ্টনিষ্ঠাই খাটো হয়, অশ্রদ্ধেয় হয়, অবজ্ঞাত হয় এবং তার নিজের ইষ্ট সম্বন্ধে ধারণার অভাবই প্রতিপন্ন হয়। একটু সহজ চোখে খতিয়ে দেখলেই বিষয়টা আরও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

আমার কাছে আমার ইষ্টের স্বরূপ হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, পূর্ণব্রহ্ম, পুরুষোত্তম কিংবা আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী চিন্ময়ী মা, অর্থাৎ সেই চরম তত্ত্ব। এখন ভেবে দেখুন, আমার ইষ্ট যেই হোন, তিনি কি এতই সীমিত এবং

গণ্ডীবদ্ধ যে, ঐ একটি ইষ্টরূপ ছাড়া অন্য কোনও রূপে প্রকাশিত হতে পারেন না? রাম কি আমার ঐ কল্পিত ধনুর্ধারী রামমূর্তিতেই আবদ্ধ? তিনি কৃষ্ণের রূপ ধরতে পারেন না, শিব কালী দুর্গার রূপ ধরতে পারেন না, চৈতন্য রামকৃষ্ণ সত্যানন্দ হতে পারেন না? মহাবীর বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক হতে পারেন না? তবে আমি যে রামের কথা বলছিলাম, যে কৃষ্ণের কথা বলছিলাম, যাঁর মূর্তি গড়িয়ে পূজা করছিলাম, তিনি কেমন চরম তত্ত্ব, কেমন পরম তত্ত্ব? যাঁর এইটুকু ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা নেই, যাঁর এইটুকু ইচ্ছা করার বা ইচ্ছামত চলার সাধ্য নেই, তিনি কেমন ভগবান? ঠিক একই প্রশ্ন করতে হবে শিব যার ইষ্ট তাকে, চৈতন্য যার ইষ্ট তাকে, রামকৃষ্ণ যার ইষ্ট তাকে, কালী দুর্গা মহাবীর বুদ্ধ শংকর কিংবা নানক যার ইষ্ট তাকে। তোমার ইষ্ট যদি ভগবান, তবে তাঁর মধ্যে সব এবং সবের মধ্যে তিনি—এটাই কি নিশ্চিত সত্য নয়? তাঁকে কি আমাদের বুদ্ধির ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ ক'রে আমরা জেলখানার সেলে ঢুকিয়ে রাখতে পারি? হয়তো ভগবানের তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমরাই সংকীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে যাই। খণ্ডিত চেতনা নিয়ে ভূমার আনন্দ বিরাট অসীমের আনন্দ আমরা আস্বাদন করতে পারি না।

পরম সত্যাশ্রয়ী তত্ত্বই সমাধান

আসলে তিনি সব হতে পারেন। সব রূপই পরব্রহ্মের প্রকাশ। তিনিই বহুভাবে বহুরূপে লীলায়িত হয়েছেন। তাঁর মধ্যেই সব রূপ, আর সব রূপেই তিনি। এটা বুঝতে পারলে, ভাবতে পারলে, জানতে পারলে সব বিরোধ তৎক্ষণাৎ মিটে যায়। এই পরম সত্য অথবা পরম তত্ত্বের জ্ঞানই সংকীর্ণতার অবসান ঘটাতে পারে।

পরম সত্যাশ্রয়ী এই তত্ত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন হলেই শাক্ত-বৈষ্ণব বিবাদ,

সাকার-নিরাকার বিবাদ, সগুণ-নির্গুণ বিবাদ, দর্শনে দর্শনে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রচলিত সবরকম বিবাদ অন্তর্হিত হতে বাধ্য। কারণ, আপাতবিরোধী মতগুলির অতি গভীর মূল তত্ত্ব বা উদ্দেশ্য যে পরম সত্যস্বরূপ ভগবৎতত্ত্ব। সেই তিনিই বহুভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন বৈচিত্র্যের মধ্যে। তাই বৈচিত্র্যকে ঠিক রেখেও মৌলিক ঐক্যের অবস্থান অতি সহজেই সম্ভব হতে পারে প্রতিটি হিন্দুর ভাবরাজ্যে।

অতএব প্রথম থেকেই ঐ পরম তত্ত্বের বিষয়ে সঠিক উদার ধারণা যদি ক'রে নেওয়া যায়, এবং শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরায় সেটি সঞ্চারিত হতে থাকে, তাহলে সংকীর্ণতার বা ক্ষুদ্র বাদবিতণ্ডার অবকাশ আর থাকে না। ধর্মজগতে নিজেদের সার্বভৌমত্ব এবং বৈশিষ্ট্যকে সগৌরবে বজায় রেখেও অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন মিলিয়ে নিত্য মিলনভূমি রচনা করা যায়। এটা করলে হিন্দুধর্মের ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয় রূপই সমানভাবে প্রকাশিত হবে। সম্প্রদায়গুলিও পুষ্ট হবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে, আবার পাশাপাশি সম্প্রদায়সমূহের একটি সমষ্টি সত্তাও প্রকাশিত হবে। এর জন্য চাই শুধু মিলনভূমি নির্মাণের ইচ্ছা।

অবশ্য বিচ্ছিন্নতাকে ধরে রাখাই যাদের মূলধন, তাদের কথা আলাদা। তবে তাদেরও ভাবতে হবে অদূর ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে। বৃথা অহংভাবের গণ্ডী টেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোয় বিভক্ত থাকার সময় এটা নয়। কারণ, বহুবিধ ভোগবাদী শক্তির প্রবল আক্রমণের মুখে হিন্দু ধর্মসংস্কৃতি এবং হিন্দুজাতি ঘোর সংকটের সম্মুখীন। একটি জাতির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখন বিচ্ছিন্নতাজনিত দৌর্বল্য তার পক্ষে আত্মহত্যারই আবাহন। তাই এখন ঐ ভিত্তিহীন গণ্ডীগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার প্লাবনে, পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে আপন ক'রে নেওয়ার

মাধ্যমে। পরস্পরের মনকে বুঝতে হবে, হৃদয়কে বুঝতে হবে, আবেগকে আকুতিকে অনুভব করতে হবে, পরস্পরের প্রয়োজনকে জানতে হবে। তবেই প্রতিটি হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে প্রকৃত সহানুভূতি। একজন হিন্দুর সঙ্গে একজন হিন্দু মতপথের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ভাব বিনিময় করতে পারবে এবং শ্রদ্ধাভরা সহানুভূতি ভরা হাতটি বাড়িয়ে দিতে পারবে। আজ এটা করা অনিবার্য্য হিন্দুজাতির আত্মপরিচয়ের গৌরবরক্ষার তাগিদেই। অথচ এই মহৎ কর্তব্য থেকে আমরা সরে থাকি অযথা নানান্ তর্ক তুলে।

হিন্দু-সংহতি কখনওই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নয়

একদল মানুষ হিন্দু জাগৃতি, হিন্দু নিষ্ঠা, হিন্দু সংহতি ইত্যাদি শুনলেই বলে ওঠেন, এটা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান তিনকেই এক ক'রে হিন্দুদের করতে হবে জাতীয় সংহতি। গীতা-ভাগবত উচ্চারণ করলেই হিন্দুদের এক নিঃশ্বাসে বলতে হবে, কোরান বাইবেল। মন্দির বললেই হিন্দুদের একই সঙ্গে বলতে হবে, মসজিদ গির্জা। তাই বলে একই সূত্র ধরে মুসলমানদের ক্ষেত্রে কোরানের সঙ্গে গীতা-ভাগবত-বাইবেলকে বসানো যাবে না। খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে বাইবেলের সঙ্গে গীতা-ভাগবত-কোরানকে বসানো যাবে না। মসজিদ বললেই তার পাশে মন্দির আর গীর্জা কল্পনা করা যাবে না; গীর্জা বললেই তার পাশে মন্দির এবং মসজিদ কল্পনা করা যাবে না। কিন্তু কেন? সে কথা তথাকথিত জাতীয় সংহতির প্রবক্তারা কখনও ভাবেন না। তাঁরা শুধু ভাবতে অভ্যস্ত হিন্দুদের যা কিছু নিজস্ব, যা কিছু স্বকীয় তার উপর দুটি বড় থাবা বসানোর কথা। উদারতার দোহাই পেড়ে, মানবধর্মের দোহাই পেড়ে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই বঞ্চিত করা হচ্ছে স্বাতন্ত্র্যের স্বাধিকার থেকে।

এসব কথার যাঁরা প্রবক্তা, এসব ঢাক পেটানো প্রচারের মাধ্যমে সংহতির প্রচেষ্টায় যাঁরা রত, তাঁরা কতকগুলি ক্ষুদ্র স্বার্থের বিষয় ছাড়া কোনও বিষয়ের গভীরে যান না, যেতে চান না। তাঁদের কাছে 'where ignorance is bliss, it is foly to be wise'—না জানাটাই তাঁদের পুঁজি এবং তার ফলে সুবিধাবাদী কিছু ভ্রান্ত ধারণার প্রচার ক'রে তাঁরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। এতে তাঁদের ক্ষুদ্র এবং সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধ হলেও, হিন্দুত্বকে যে বিলুপ্তির গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁরা বুঝেও বোঝেন না, জেনেও জানেন না। খুঁজলে দেখা যাবে, হয়তো এসব তথাকথিত উদার জাতীয় সংহতির প্রবক্তাদের হাজার জনের মধ্যে একজনও কোরান বাইবেল পড়েন নি। হিন্দুধর্মে শতসহস্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐ দুটি মতাদর্শের তাত্ত্বিক প্রভেদ কোথায়, তা তাঁরা খতিয়ে দেখেন না এবং ঐ তাত্ত্বিক প্রভেদের ফলে তথ্য কী রূপ পরিগ্রহ করছে সেটাও তাঁরা খতিয়ে দেখতে চান না। আসলে জানলেই তো মানতে হবে। আর মানলেই স্বার্থের সংকট। তাই ঢাক পিটিয়ে সাম্প্রদায়িকতার কালি 'হিন্দু' শব্দের ওপর মাখিয়ে দিয়েই তাঁরা কৃত্য সম্পাদন করতে চান।

কিন্তু বস্তুতঃ সত্যিকার হিন্দু-জাগৃতি, হিন্দুনিষ্ঠা, হিন্দুসংহতি প্রভৃতি ধারণার মধ্যে কোনও সংকীর্ণতা নেই, কোনও বিদ্বেষ নেই, কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থযুক্ত উদ্দেশ্য নেই। শুধু একটি জাতি তার সুমহান অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। বাস্তবকে সামনে রেখে এই বাঁচার অধিকারটুকু অর্জন করতেই হবে হিন্দুদের। এতে দোষের কী আছে? দোষের কী থাকতে পারে? কই, খ্রীষ্টান বা মুসলমানরা তাদের জাতিগত ধর্মগত পরিচয় নিয়ে সগর্বে নিজেদের অস্তিত্বকে

সুদৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলে এবং স্বধর্মনিষ্ঠা ও সংগঠিত শক্তি প্রকাশ করলে সেটা তো দোষের হয় না!

হিন্দুর মস্তিষ্ক ও ইসলামিক দেহের তাৎপর্য

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী তো খুবই স্পষ্ট। তাদের মতে 'A believer is like a brick for another believer, the one supporting the other'; 'The believers are like one person, if his head aches, the whole body aches with fever and sleeplessness (Hadis)

'বিশ্বাসী মুসলমানগণ দেওয়ালের ইঁটের মত পরস্পরের সহায়ক।' 'বিশ্বাসী মুসলমানগণ একটি মানুষের আকার। যদি তার মাথায় ব্যথা হয়, তাহলে তার সমস্ত দেহে জ্বর ও নিদ্রাহীনতার সঙ্গে ব্যথাটি সঞ্চারিত হবে।'

এটাকেই বলা হয় ইসলামিক দেহ। বিবেকানন্দ হিন্দুদের জন্য বলেছেন, ইসলামিক দেহ ও হিন্দুর মস্তিষ্কের সমন্বয় করার কথা। ইসলামিক দেহটি ঐ জাতির সংগঠিত, নিয়মনিষ্ঠ, আনুগত্যনিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ রূপকেই বোঝায়। মস্তিষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা, শিল্পচেতনা, জীবনচর্যা ও সুসভ্যতার অপূর্ব ক্ষেত্র হিন্দুর মস্তিষ্ক। হিন্দুর মস্তিষ্ক সর্বভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক—সে কথা বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু হিন্দুর দেহ অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ রূপ যে সামগ্রিকভাবে দৃঢ় ও সক্ষম নয় সেটাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই বলেছিলেন—স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ, সুসংগঠিত, শক্তিমান, ঐক্যরূপ প্রকাশ করতে। হিন্দুকে সুসংগঠিত হওয়ার এই প্রেরণাও আজ বিকৃত ব্যাখ্যার শিকার। বিবেকানন্দের বাণীর অপব্যাখ্যা ক'রে চলেছেন তথাকথিত উদারতা ও জাতীয় সংহতির প্রবক্তারা। তাঁরা হিন্দুর সংগঠিত রূপ

প্রকাশকে এক অজানা ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখেন। অথচ তাঁরাই মুসলমানদের ডিসিপ্লিন এবং জাতিগত ঐক্যের কথা প্রশংসার সুরে উল্লেখ করেন। ভাববার কথা—সেই একই জিনিস হিন্দুরা করলে, সেটা দোষের হবে কোন যুক্তিতে! একই প্রকার মানবিক অথবা জাতীয় কর্তব্যের মূল্যায়নের দু'রকম তুলাদণ্ড তো কখনওই হতে পারে না। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদের পক্ষে যে নিষ্ঠা, যে সংহতি প্রশংসনীয়, সেই নিষ্ঠা বা সংহতির প্রয়াসই হিন্দুদের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা? তা তো হ'তে পারে না। তাই অমুক অমুক কী বলতে পারে, কী ভাবতে পারে ইত্যাদি অমূলক আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে হবে হিন্দুদের। কারণ, সত্যকে আঁকড়ে ধরাই হিন্দুর ধর্ম। সত্যকে আঁকড়ে না ধরলে হিন্দুত্বই লোপ পাবে, এটাই তো আসল আশঙ্কার বিষয়।

হিন্দু জাগরণ ও সংহতি নেতিবাচক নয়

ইদানীংকালে একদল মানুষ হিন্দুর উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় বা প্রমাণ বলতে মুসলামানদের প্রতি তার শ্রদ্ধা, উদারতা ও প্রীতির বহিঃপ্রকাশকেই বোঝান। আবার একদল মানুষ হিন্দু জাগরণ মানে মুসলমান বিতাড়ন মনে করেন। আসলে দুটোই ভুল ধারণার অভিব্যক্তি। হিদু নিজের উত্থানের জন্য কোনও কিছু করলেই সেটাকে খ্রীষ্টান বা মুসলমানের সঙ্গে জুড়ে দেখতে হবে কেন? হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্বই বিশ্বব্যাপী এবং উদার। সারা বিশ্বের মানুষই তার উদারতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ। হিন্দুজাগরণের সঙ্গে কোনও নেতিবাচক অভিপ্রায়ের সম্পর্ক অবান্তর। আমাদের কাছে হিন্দুজাগরণ অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় হিন্দুত্বের সামগ্রিক ও পূর্ণতর প্রকাশের জন্য। এর সঙ্গে ওপরপড়া হয়ে মুসলমান বা খ্রীষ্টানদের কথা টেনে এনে

জড়ানো বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অদ্ভুত প্রভাব পরিণাম ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না।

হিন্দু ঐক্যভাবনা ইতিবাচক ও গঠনমূলক। হিন্দু ঐক্য কখনও কারও ভয়ের কারণ হতে পারে না। এর ভেতরের মূল সত্তাটাই innocent non-violent—নির্দোষ, অহিংস। হিন্দুর পথ হিংস্র আগ্রাসনের পথ নয়; হিন্দুর সংগঠিত ঐক্যরূপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও নয়। এর সবটুকুই positive বা ইতি বাচক মহৎ উদ্দেশ্যযুক্ত। সূক্ষ্ম অধ্যাত্মকেন্দ্রিক মহৎ ভাবরাশির অভাবেই বিশ্বের চারদিকে অশান্তির আগুন জ্বলছে। ব্যক্তিগত জীবন ও জাতিগত জীবন সর্বত্রই অশান্ত হয়েছে চির অতৃপ্ত ভোগবাসনার জ্বালায়। ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় বিধায়ক হিন্দুদের তাই সমগ্র মানবতার ক্রন্দনে কর্ণপাত করতে হবে। মাত্র আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হিন্দুর জন্ম নয়। তাই দাবিদাওয়া আদায়, অধিকার আদায় কিংবা কোনও কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার মনোভাব এই ঐক্য ভাবনায় নেই। এতে আছে শুধু নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শাশ্বত ঐশ্বর্যকে ধরে রাখার আগ্রহ। এ ঐশ্বর্য হিন্দুর নিজস্ব সম্পদ হয়েও সারা বিশ্বের সম্পদ। এর সুরক্ষা হিন্দুর গুরুদায়িত্ব।

বর্তমান রাজনীতির অশুভ প্রভাব

ইদানীংকালে, বিশেষ ক'রে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর থেকে লক্ষ্য করা যায়, মানুষের কাছে তার জন্মগত, জাতিগত, গুণগত ব ধর্মগত মূল পরিচয় গৌণ হয়ে গিয়ে, তার রাজনৈতিক তথা দলগত পরিচয়টাই প্রথম পরিচয় ও বড় পরিচয় হয়ে উঠছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার এটাই বিশিষ্ট ফল। দলনেতারা মানুষকে দেখছে ভোটার রূপে। মানুষ তার পাশের মানুষকে চিনছে রাজনৈতিক দলে

লেবেল দেখে। হিন্দুধর্মবর্জিত রাজনীতির চশমা এঁটে পরস্পর পরস্পরকে দেখছে। ফলে তারা শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের পরিচয় নিয়ে মানুষকে ভালবাসতে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে, মানুষের সঙ্গে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাভরা আদানপ্রদান করতে পারছে না। কেউ যেন কারও প্রতি মুক্তহৃদয় নয়। সাধারণ মানুষের স্থান পরে, দলের স্থান আগে। এই ভাব নিয়ে চলছে সমাজ। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়টাই তো মানুষের আসল পরিচয় নয়। মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যত্ব এবং সেই মনুষ্যত্বের মূল হচ্ছে তার ধর্ম সংস্কৃতি-সভ্যতা।

রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা অন্যান্য ঐক্যভাবনা সাময়িক এবং পরিবর্তনশীল। এর দ্বারা সাময়িক জাগতিক প্রয়োজন মাত্র সিদ্ধ হতে পারে, তাও আবার দলগত গরিষ্ঠতা সাপেক্ষে। রাজনৈতিক বা অন্যান্য সামাজিক ঐক্য তাই একটা যেন ওপর ওপর ঐক্য। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মজগতে, অধ্যাত্মজগতে, সাংস্কৃতিক জগতে, যে ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান, সেটা চিরন্তন এবং শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ভিত্তি বা মূল সেই পরম তত্ত্বে, পরমাত্মায়, পরমসত্যস্বরূপ ভগবানে বিধৃত। সেই পরম সত্যের প্রকাশ-বৈচিত্র্যকে জেনে বা উপলব্ধি ক'রে ঐক্যের নিটোল অনুভূতিকে বাস্তবায়িত করা যায়। সেখানে কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ বা জাগতিক প্রয়োজন থাকে না। একটা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতোই নিঃস্বার্থভূমিতে অবস্থিত এই একাত্মভাবের অস্তিত্ব। এর থেকে একটি সমগ্র জাতি সঞ্জীবিত হতে পারে, জীবনরস আহরণ করতে পারে, পুষ্টিলাভ করতে পারে। একথা বুঝতে হবে বিশ্বের প্রতিটি হিন্দুকে। তবেই অটুট থাকবে জাতি ও সভ্যতা হিসাবে হিন্দুর অস্তিত্ব।

চাপানো সংহতির মরীচিকায় দুর্গতি

সংগঠিত হিন্দুশক্তির প্রতিষ্ঠা, যা আজ অবধি হয়ে ওঠেনি, অ
করা একান্ত প্রয়োজন, তা এখন থেকেই করার চেষ্টা করতে হ
অনিবার্য প্রয়োজন বোধ এবং সদিচ্ছা যদি থাকে তাহলে 'অসম্ভব ন
কিছু এ মর ধরায়'। প্রথমেই যদি বলতে সুরু করি—'এ অসম্ভব,
কী ক'রে হবে!' তাহলে সাফল্য অর্জন হবে সত্যিই অসম্ভব। কিন্তু মা
কী না পারে! আত্মবিশ্বাস এবং ভগবদ্ বিশ্বাসকে এক ক'রে অহংকার
সমর্পণ ক'রে আমরা সকলে যদি কাজে নামি, তাহলে তাঁর কৃপ
স্বর্গকেও নামিয়ে আনতে পারি পৃথিবীর বুকে। হিন্দু ঐক্যের প্রয়াস
স্রোতের অনুকূলে তরী বাওয়া।

অথচ এটা না ক'রে, যে ঐক্য অবাস্তব মরীচিকা তার জন্য আম
আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে শক্তি ও আয়ু ক্ষয় করছি। হিন্দুর মধ্যে রয়ে
যে অসংখ্য সম্প্রদায়, তাদের মূল ভাবাদর্শ এক। কিন্তু তাদের ম
পরস্পরের ঐক্য প্রচেষ্টার প্রথম এবং সহজ কৃত্যকে এড়িয়ে, আম
বহু আড়ম্বর ও প্রচার সহযোগে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলাম ও খ্রীষ্টানদে
ঐক্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়েছি। অথচ একবারও তুলনামূলকভাবে গভী
অধ্যয়ন ক'রে দেখছি না, হিন্দুত্বের অসংখ্য শাস্ত্র গ্রন্থ, তত্ত্ব ও ভাবাদর্শে
সঙ্গে ইসলাম এবং খ্রীষ্টানের মৌলিক প্রভেদ কোথায়। এই 'পর্ব
ব্যবধান' মেটানোর দায় কি একা হিন্দুর? এবং তাও যদি হয় তাহ
সেই হিন্দুর সমগ্র ঐক্যসত্তার পূর্ণরূপ কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাকে এ
শব্দে 'হিন্দু' ব'লে খ্রীষ্টান এবং ইসলামের পাশাপাশি দাঁড় করানো যায়
তা তো করা হয়নি। শতধা বিভক্ত খণ্ড খণ্ড সাম্প্রদায়িক পরিচয়যু
অনেক মানবগোষ্ঠীকে দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা নামের একক রূপে

কিন্তু এদের সমষ্টি সত্তার সামগ্রিক একক রূপ, যা 'হিন্দু' নামে পরিচিত, তার অস্তিত্ব কোথায়? সেটি তো দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় ঐ চাপানো প্রকৃতির ফল হচ্ছে শুধু একতরফা হিন্দুসমাজের দুর্গতি। এ কথা আজ বিশেষ হৃদয় মন দিয়ে বুঝতে হবে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত সব ধর্মমতের পথিকৃৎ, প্রবক্তা ও পথিকদের। শুভস্য শীঘ্রম্। বিলম্বেন অলম্। সময় বয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্নতার ঘোরের মধ্যে এভাবে কালাতিপাত করলে ভগবানই বা সহায় হবেন কী ক'রে? God helps those, who help themselves. এখন তাই তিক্ততা ও বিচ্ছিন্নতাবর্ধক বৃথা বিতর্ক বর্জনীয়। মিলনের মধ্যে পূর্ণতাকে খুঁজতে হবে এবং পূর্ণতার মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে মহামিলনের আনন্দ। এরজন্য হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন।

হিন্দুর আত্মসমীক্ষা কর্তব্য, আত্মনিন্দা নয়

হিন্দুদের সবচেয়ে বড় দোষ ব্যক্তিগত এবং ক্ষুদ্রদলগত আত্মকেন্দ্রিকতা। ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তায় তার হৃদয় ক্রমশঃ হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত। অপর একজন হিন্দুর প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে না প্রকৃত আত্মিক সহানুভূতি। তার ওপর আছে ভয়ানক ঈর্ষার প্রকোপ। ঈর্ষা দাবানল হয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে একটি গোটা জাতির মহান্ জীবনকে। ব্যষ্টি হিন্দুর হুঁশ নেই। সম্পূর্ণভাবে অচেতন ও অহমিকায় মদমত্ত হয়ে সে সমষ্টির কথা, পরবর্তী প্রজন্মের কথা কিছুই ভাবছে না। নিজেরটুকু ছাড়া তার চিন্তার জগতে আর কিছু প্রবেশ করে না। পাশের মানুষটির কী হচ্ছে, সমাজের কী হচ্ছে, সে সব ভাবার তার আগ্রহ নেই। শ্রীঅর্চনা মা প্রায়ই বলেন, হিন্দুরা হয় callous নয় jealous, হয় নিস্পৃহ নয় ঈর্ষান্বিত। কারও কোনও মাথাব্যথা নেই সমাজ বা দেশের জন্য। আর যদি কেউ কিছু

সৎকাজ বা মহৎকাজ করতে যায় তো তার প্রতি তাকাবে হিংসার চোখে ঈর্ষার চোখে। সাহায্য তো দূরের কথা, কী ক'রে ক্ষতি করবে সেই চেষ্টা করবে। কিন্তু এখন এসব করলে হিন্দুজাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে ক্রমশঃ। এখন বাঁচতে হলে প্রথমেই ত্যাগ করতে হবে এই নিস্পৃহ উপেক্ষার ভাব আর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার ভাব। এই কথাটি হিন্দুমাত্রেরই মননীয় ও পালনীয়।

ভারতবর্ষে দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ চিরকাল হিন্দুধর্মাশ্রয়ী। সমগ্র হিন্দুসমাজের মিলিত ঐক্যরূপ ছাড়া এদেশের মূল সত্তার উপলব্ধি সম্ভব নয়। দেশের মৌলিক সমগ্রতার নিটোল রূপকে না বুঝলে দেশপ্রেমের ভিত্তি হয়ে পড়ে অদৃঢ়। এই উপলব্ধির জন্য একাধারে ধর্মবোধ ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় সংকীর্ণ যে চিত্ত, সেখানে উদার দেশপ্রেম কী ক'রে স্থান পাবে? স্বার্থত্যাগ ছাড়া দেশপ্রেমের কথা অর্থহীন। স্বার্থত্যাগের আগ্রহ বাড়লে, ঈর্ষা আর উপেক্ষার মনোভাব আপনিই কমে যাবে।

হিন্দুদের একটা আধুনিক ফ্যাশন হয়েছে, যে কোনও ছুতোয় হিন্দুদের নিন্দা করা, হিন্দুদের সবকিছুকে খারাপ বলা, কুসংস্কার বলা, হিন্দু হয়ে হিন্দুকেই বিনা যুক্তিতে সাম্প্রদায়িক বলে দোষারোপ করা এই রকম আত্মনিন্দা, শত্রুদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া অথবা নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারার তুল্য।

আত্মসমীক্ষা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা নিজেদের উন্নতি ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে, নিজেদের দুর্বলতার ঢাক পেটানোর উদ্দেশ্যে নয়। গঠনমূলক কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মসমীক্ষা ও আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু বৃথা দোষদৃষ্টি অবশ্যই

বর্জনীয়। তাই সাধারণভাবে অধুনা প্রচলিত হিন্দুনিন্দার সংস্কারকে ভাঙতে হবে। হিন্দুনিন্দা বন্ধ করতে হবে প্রত্যেক হিন্দুকে। "হিন্দুর দুর্গতি মূলে দুর্মতি হিন্দুর / প্রায়শ্চিত্ত অন্তে হবে দুঃখদৈন্য দূর।" ঠিকই বলেছেন কোনও মহাকবি। হিন্দুরা নিজেদের ক্ষতিসাধনে নিজেরাই লিপ্ত হয়েছে বহুকাল ধরে। স্বদেশের নিপীড়িত অজ্ঞ দরিদ্র কোটি কোটি মানুষের প্রতি সমগ্র হিন্দুসমাজ একত্রিত হয়ে সহানুভূতিযুক্ত হয় নি। ঐ সকল কোটি কোটি মানুষ সমভাবে নিপীড়িত হয়েছে হিন্দুদের দ্বারা, মুসলমানদের দ্বারা, খ্রীষ্টানদের দ্বারা। আজ কিন্তু তাদের তুলে আনতে হলে এগিয়ে আসতে হবে নিষ্ঠাবান হিন্দুদেরই।

নিষ্ঠাবান হিন্দুর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বলেছেন— 'We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, the Mohamedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i.e. from the orthodox Hindus.' অর্থাৎ 'আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, ভারতে এটাই সকল দুঃখের কারণ। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয় তাই করতে হবে এবং কোটি কোটি অবহেলিত মানুষকে তুলতে হবে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের ওঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকেই আনতে হবে, অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে।'

বিবেকানন্দের এই উপদেশে এটা খুবই স্পষ্ট যে, ভারতের

জাতীয়তারূপী আত্মপরিচয়ের বিলুপ্তিই সব নষ্টের মূল। এই জাতীয়পরিচয় হচ্ছে তার হিন্দুত্ব। নিষ্ঠাবান হিন্দুগণই আবার তুলে আনবে সেইসব অবহেলিত, দলিত আত্মপরিচয়হীন মানবকুলকে, আর ফিরিয়ে আনবে সমগ্র জাতির পরিচয়ের গৌরব। অত্যন্ত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দৃষ্টি দিতে হবে ঐ কোটি কোটি উপেক্ষিত লাঞ্ছিত মানুষের দিকে। তাদের দলিত, অন্ত্যজ, অনুসূচিত জাতি, নিম্নবর্গ, পিছড়ে বর্গ, অস্পৃশ্য ইত্যাদি বহু অপমানজনক বিশেষণে বিদ্ধ ক'রে চলেছে সমাজ। আজ তাদের নিয়েই চলেছে নিছক রাজনীতির নিষ্ঠুর খেলা। রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী একদল মানুষ তাদের কাজে লাগাচ্ছে নিজেদের গদির স্বার্থে। আর বিধর্মীর দল তাদের নানা প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত ক'রে নিজেদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টায় লেগে রয়েছে।

এই সর্বহারা বিরাট জনসমূহকে তুলে আনতে হবে। হিন্দুত্বের গৌরবময় পরিচয়ের উত্তরাধিকার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে। তার জন্য তাদেরকে দিতে হবে তাদেরই পছন্দমত ইষ্ট ও ধর্মপথ নির্বাচনের অধিকার ও সুযোগ, দিতে হবে সদাচার-শিক্ষা, সমাজবোধ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং দীক্ষা। তাদেরও দিতে হবে শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়গত পরিচিতির সঙ্গে নৈষ্ঠিক হিন্দু পরিচিতি। তাদের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে হিন্দুত্বের গৌরববোধ। খালি পেটে ধর্ম হয় না ঠিকই। কিন্তু শুধু রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিলেই দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না। তাদের অন্নবস্ত্রাদির সঙ্গেই দিতে হবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মর্যাদা।

যাদের জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাদের সসম্মানে হিন্দুধর্মে

হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। তারা যেন পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে ফিরে পায় তাদের উত্তরাধিকার। সেটাও দেখতে হবে হিন্দুসমাজকেই। এর জন্য চাই গোঁড়া বা স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রয়াস।

দেশ এবং জাতির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংযত, ধর্মানুগত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনচর্যায় যারা অভ্যস্ত, তাদেরই বলা হয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে গোঁড়া বা orthodox কথার অর্থ সংকীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোটেই নয়। এই রকম নিষ্ঠাবান উদার হিন্দুদের ঐক্য একটা বিরাট শক্তির উৎস। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারাই হবে ব্যক্তির মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, দেশের মঙ্গল ও বিশ্বের মঙ্গল।

হিন্দু ঐক্যের স্বরূপ

কেমন হবে এ ঐক্যের রূপ? এ ঐক্য হবে ভাবরাজ্যে, হৃদয়ের উপলব্ধির রাজ্যে, উদার অনুভূতির রাজ্যে। এ ঐক্যভাবনা শুধুমাত্র বহিরঙ্গ সাংগঠনিক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তৃতি সূক্ষ্ম অন্তর্লোকে।

বিবেকানন্দের একটি কথা খুবই অর্থবহ। তিনি বলেছেন—'ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্বসাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।'

লক্ষ্য করার কথা এই যে, হিন্দুধর্মের অসংখ্য মতপথের সবগুলোই মূলতঃ একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা। তাই ভারতবর্ষে জাতি গঠনের জন্য প্রথম প্রয়োজন হিন্দুদের মধ্যে একত্বসাধন। হিন্দু কথাটার তাৎপর্য

সঠিক অনুধাবন করাও তাই বিশেষ দরকার। এবং তারই সঙ্গে বোঝা দরকার এই একত্ব কেমন হবে।

হিন্দু ঐক্য একটি মাত্র মত বা একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সরল সাংগঠনিক ঐক্য নয়, অসংখ্য আপাতবিরোধী মত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, বহু বৈচিত্র্যযুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম মনুষ্য গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবন্ধন। তাই এই ধরণের ঐক্য ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা খুবই দুরূহ এবং জটিল কাজ। এ যুগের বরিষ্ঠ অবতার শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব এ বিষয়ে চল্লিশের দশকে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, একটি মহাবাণী উচ্চারণ ক'রে হিন্দুসমাজকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুগভগবান শ্রীসত্যানন্দ বলেছিলেন—'ধর্মরাজ্যে যারা পথিকৃৎ, পথচারী, তাদের সকলেরই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবনযাপন করা উচিত। সমষ্টির কল্যাণদৃষ্টিও প্রয়োজন। সাধু গৃহী প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে, সংঘই শক্তি। কাজেই এই সংঘশক্তি বৃদ্ধি করা সর্ব ধর্মপথের পথিকদের কর্তব্য। আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ সংঘের প্রতি প্রীতিযুক্ত হতে হবে। ধর্মকে মহনীয় ও শক্তিমান ক'রে তুলতে হবে। ধর্ম শুধু নিজের জন্য নয়। ধর্মাচরণ বিশ্বযজ্ঞের প্রয়োজনেও সাধিত হওয়া উচিত। আজ উপনিষদের 'সহনাববতু'-র কথা ভাববার দিন এসেছে। প্রতি ধর্মসংঘকে অন্য সংঘগুলির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে—ধর্মে ইউ. এন. ও. গড়ে তুলতে হবে।'

শ্রীঠাকুরের এই বাণীর মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে হিন্দুদের বহু বৈচিত্র্যময় ধর্মপথের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যবিধানের বাস্তব সূত্র। ইউ.এন.ও. কথাটার মধ্যে রয়েছে ধর্মসম্প্রদায়গুলির সার্বভৌম সত্তাকে অটুট রেখে একটি মহাসংঘ নির্মাণের কথা। এটাই হিন্দুধর্মের আপাত জটিল ঐক্যভাবনাব

সহজ বাস্তবানুগ সমাধান। এই ইউ. এন. ও বা মহাসংঘ হবে অন্যান্য বহু ধর্মসংঘের মিলিত প্রতিনিধিত্বমূলক মঞ্চ। এর কণ্ঠস্বর হবে সমগ্র হিন্দুসমাজের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। ব্যষ্টির ভাব আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে সমষ্টির ভাব আদর্শ হবে প্রকাশিত।

ঐক্যবদ্ধ হিন্দুত্বের নিয়ামক অপৌরুষেয় তত্ত্ব

এই হিন্দুধর্মমহাসংঘের নিয়ামক শক্তি হবে এক অপৌরুষেয় তত্ত্ব। হিন্দুদের ধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের মত থেকে উদ্ভুত নয়। শাশ্বত সনাতন তত্ত্বরাশি অনাদিকাল থেকে শ্রুতিমুখে প্রবহমান। তারই বিভিন্ন প্রকাশ বিভিন্ন ধর্মরূপে বিদ্যমান। এর প্রামাণ্য নির্ভর করে না কোনও বিশেষ ব্যক্তির ঐতিহাসিক অস্তিত্বের ওপর অথবা তার প্রবর্তিত মতবাদের ওপর। হিন্দুধর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ অপৌরুষেয় ধর্ম।

তাই এর নিয়ামক শক্তিও অপৌরুষেয় তত্ত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ অসংখ্য অবতার, মহাপুরুষ, আচার্য, গুরু এবং প্রবক্তাগণ। এই অপৌরুষেয় তত্ত্ব একদিকে যেমন ব্যক্তিনিরপেক্ষ, তেমনি অপরদিকে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। তাই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তির পূজা সেই অপৌরুষেয় তত্ত্বের প্রতিনিধিত্বেরই পূজা। অবতার মহাপুরুষগণ সেই অপৌরুষেয় তত্ত্বের অভিব্যক্তিরূপ ব্যক্তি মাত্র। এঁরাই যুগপুরুষরূপে, হিন্দুধর্মের নিয়ামকশক্তিরূপে, নিয়ন্ত্রক এ পরিচালকরূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন যুগে যুগে। এঁদের বরণ করতে হবে উদার বুকে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মহাপরিচালকের আসনে।

এই মহৎ উদ্দেশ্য একদিন দুদিনের সামান্য উদ্যোগেই হঠাৎ সিদ্ধ হয়ে যাবে, এরকম আশা অবাস্তব। এর জন্য চাই তপস্যা ও প্রস্তুতি। কঠোর অধ্যবসায় এবং ত্যাগ স্বীকারপূর্বক লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে।

গঠনমূলক কাজের একটা সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া সুরু করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূরপ্রসারী হবে এর কর্মপ্রণালী। ফল ক্রমশঃ ফলবে। গুণগত এবং তত্ত্বগত দিকে দৃষ্টি রেখে বাস্তবানুগ আদর্শ মডেল তৈরি ক'রে কাজ শুরু ক'রে, পরে তাকে সংখ্যাগত দৃষ্টিতে বিস্তৃত করতে হবে সমাজের ও দেশের সর্বক্ষেত্রে। 'শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ' এমনই এক বহুমুখী প্রকল্প। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আদর্শ মডেল। তার জন্য অনেক কিছুই করণীয় আছে হিন্দুদের। আজ প্রয়োজন শ্রীসত্যানন্দের ঐ উপদেশ বাণীর মর্মোপলব্ধি করা এবং সেটাকে কার্যান্বিত করা অর্থাৎ হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক স্তরে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মহাসঙঘ নির্মাণ করা।

ধর্মাচার্যদের বিশেষ দায়িত্ব

প্রথমেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গুরু, আচার্য্য, মঠাধ্যক্ষ, সন্ন্যাসীবৃন্দকে একই সঙ্গে শিষ্য-ভক্তদের দিতে হবে নিজ নিজ সম্প্রদায়গত নিষ্ঠার দীক্ষা, আর হিন্দুত্বের সামগ্রিকতার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যুক্ততার বোধ। এই দুটি উপলব্ধি একই সঙ্গে সঞ্চারিত করতে হবে সমগ্র হিন্দুসমাজে। শুধু বিশেষ সম্প্রদায়গত একক রূপে নয়, সমগ্র হিন্দুসমাজের অঙ্গ রূপেও একই সঙ্গে ব্যক্ত হবে প্রতিটি হিন্দুর অস্তিত্ব। সে যেন তার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলতে পারে, আমি অমুক সম্প্রদায়ের হিন্দু। অর্থাৎ তার identity বা পরিচয় যুগপৎ একটি বিশেষ সম্প্রদায়গত পরিচয় এবং বিরাট জাতিগত হিন্দু-পরিচয়। এরই সঙ্গে শিষ্য-ভক্তদের এই শিক্ষাও দিতে হবে যে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের গুরু আচার্য ও ভক্তমণ্ডলীর প্রতি যে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ ও ব্যবহার করে, সেই শ্রদ্ধাই তাদের কাছে প্রত্যাশিত অপরাপর সম্প্রদায়ের গুরু-আচার্য এবং

ভক্তমণ্ডলীর প্রতি। পরস্পর পরস্পরের গুরু-ইষ্ট-নিষ্ঠাকে শতমান দেওয়া এবং সংবর্ধিত করাই হিন্দুদের আচরণে কাম্য। এই শিক্ষাও ধর্মাচার্যদের কাছ থেকে সঞ্চারিত হওয়া উচিত ভক্তশিষ্যদের মধ্যে। প্রতি ধর্মাচার্য যদি এভাবে দীক্ষা ও শিক্ষা দেন, তাহলে সমভাবাদর্শযুক্ত বিরাট হিন্দুসমাজের সমগ্রতার রূপ সহজেই চোখে পড়তে পারে।

এছাড়া যাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়গত শ্রদ্ধার আসনে বসে শিষ্যভক্ত ও জিজ্ঞাসুদের ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন, শাস্ত্রপ্রবচন শোনাচ্ছেন, আচার আচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁদের বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শিষ্যভক্ত জিজ্ঞাসুদের একটি ধর্মপথে নিষ্ঠাযুক্ত করার জন্য সেই ধর্মপথের গুণাবলী, ইষ্টের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বহুভাবে বলতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে। তার নির্বাচিত ইষ্ট যে স্বয়ং ব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান সেই পরমতত্ত্ব, তাতে যেন সংশয়ের লেশমাত্র না থাকে। কিন্তু এই কথা বলতে বা বোঝাতে গিয়ে অপরের কোনও ইষ্টমূর্তি বা ধর্মমার্গকে হেয় বা তাচ্ছিল্য করার তো কোনও কোনও যুক্তি নেই। সেটা যেন না করা হয়। ধর্মাচার্যরাই তো প্রথম শিক্ষা দেবেন নিজ ইষ্ট-নিষ্ঠার সঙ্গে অপরের ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধার। সেখানেই যদি সংকীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতার প্রকাশ থাকে, সেখান থেকেই শিষ্য ভক্ত জিজ্ঞাসুরা যদি শোনে আর শেখে যে, আমার ধর্মপথটাই ঠিক, অপরের পথ নরকগামী, আমার ইষ্টই একমাত্র সর্বোত্তম তত্ত্ব, বাকী সব নিকৃষ্ট, তাহলে ধর্মে ধর্মে মিলনের হাওয়া কী ক'রে বইবে? তাই দীক্ষা ও শিক্ষার সময় সব সম্প্রদায়ের ধর্মাচার্যগণই যদি নিশ্চিতরূপে ঠিক ক'রে নেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবেন অন্যকে খাটো না ক'রে, তাহলে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রগুলির উদার বিবেচন

এই প্রসঙ্গেই প্রয়োজন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে শাস্ত্রগুলির বিবেচন। খতিয়ে দেখতে হবে, নিজেকে বড় করতে গিয়ে অপরকে ছোট করার যে সব প্রয়াস রয়েছে হিন্দুদের কিছু কিছু শাস্ত্রে, তা কীভাবে সংশোধন করা যায় বৃহত্তর হিন্দুত্বের কথা মাথায় রেখে। যেখানেই অপরের প্রতি ঐরকম অকারণ ক্ষুদ্রতা, অবাঞ্ছিত এবং অপ্রয়োজনীয় কটূক্তি রয়েছে সেখানেই সেই ধর্মাচার্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সবিনয়ে প্রার্থনা করতে হবে পরিমার্জনার জন্য। এ বিষয়টা নিশ্চয়ই খুবই স্পর্শকাতর এবং সুকঠিন। কিন্তু বৃহত্তর ও মহত্তর প্রয়োজনের কথা চিন্তা ক'রে সেন্টিমেন্টকে দূরে সরিয়ে এ কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবান বুদ্ধিমান ঋষিমুনিবৃন্দ ও ঋষিতুল্য ভক্তগবেষকবৃন্দকে নিযুক্ত হতে হবে। সামগ্রিক উদার দৃষ্টির সঙ্গে সম্প্রদায়গত নিষ্ঠার সমন্বয় বিধান করাই হবে এঁদের লক্ষ্য। যতদূর সম্ভব negative approach বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তে positive approach বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর গ্রহণ করতে হবে। বিচ্ছিন্নতা বা খণ্ডনের পথে না গিয়ে সমন্বয় বা synthesis-এর পথ বেছে নিতে হবে। হিন্দুদের শাস্ত্রে শাশ্বত সনাতন মূল তত্ত্বগুলি সর্বত্রই এক এবং সেগুলি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। সংশোধন প্রয়োজন শুধুমাত্র ভাষ্যের ভঙ্গীতে এবং অনুশাসনের প্রয়োগে, যা দেশ, কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের যথার্থ নির্দেশনার জন্য প্রয়োজন হিন্দুধর্মমহাসংঘ, যা হবে হিন্দুধর্মানুশাসনের প্রতিনিধিত্বমূলক সর্বোচ্চ সংস্থা।

এভাবে ধর্মাচার্যবৃন্দ ও শাস্ত্রসকল যদি ক্রমশঃ উদার প্রীতি ও গভীর সহানুভূতিযুক্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে হিন্দুসমাজ ঐক্যবদ্ধ হবার পথে সঠিক

দিশা পেয়ে যাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সঠিক বস্তু ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী পেয়ে যাবে। এই process যত তাড়াতাড়ি শুরু হয় ততই মঙ্গল।

বহু বিরাট কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের সংকল্প—উদাহরণ ঃ প্রথম প্রকল্প—হিন্দুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালী

অনেক বড় বড় প্রয়োজনীয় কর্মপ্রকল্পকে রূপায়িত করার সঙ্কল্প নিতে হবে বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—হিন্দুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন এবং উপযুক্ত গুণমানের অধিকারী শিক্ষককুল নির্মাণ প্রকল্প। ফিরিয়ে আনতে হবে তপোবনের গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শযুক্ত অথচ বর্তমানোপযোগী ধর্মাশ্রিত শিক্ষাক্রম। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে করতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপ্রণালী। সংস্কৃত শিক্ষাকে করতে হবে সর্বস্তরে অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের মধ্যে অনুস্যূত করতে হবে জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু মূল মন্ত্র যা মূল্যবোধের আকর। 'আদৌ শ্রদ্ধা' সমস্ত জ্ঞানের পূর্বশর্ত। শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে হবে ধর্মের প্রতি, নিজেদের দেশের ভাব ও আদর্শগুলির প্রতি। আদর্শ আচার্য নির্মাণ হবে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী ভাবধারার দাস, কেরিয়ার-সর্বস্ব জাগতিক ভোগসুখ ও সংকীর্ণ স্বার্থসর্বস্ব মানুষ তৈরি করার যে শিক্ষাপদ্ধতি ব্রিটিশ আমল থেকে আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে তাকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করতে হবে। সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় থাকবে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানরাশির সঙ্গে বর্তমান যুগের শুভ আবিষ্কারের যোগ।

শিক্ষা যাঁরা দেবেন তাঁরা হবেন সত্যই আচার্য, যাঁদের ত্যাগ-সংযম ও আচার-আচরণ দেখে আদর্শ শিক্ষা পাবে ছাত্ররা। সেই সব শিক্ষকদের বিশেষ যত্ন-সহকারে তৈরি করতে হবে আচার্যপদের উপযুক্ত ক'রে। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষকের এবং আচার্যবর্গের আবশ্যকতা রয়েছে

এই বিশাল দেশের কোটি কোটি অজ্ঞ অশিক্ষিত অদীক্ষিত মনুষ্যকুলের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনকে পূর্ণ করার জন্য। এই শিক্ষকদের এবং আচার্যদের গুণমান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন হিন্দুত্বনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবান প্রবীণ আচার্যবর্গের মার্গদর্শন। শুধু ডিগ্রীধারী নয়, উচ্চ আদর্শবান, হৃদয়বান, নিঃস্বার্থপ্রাণ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারী সংযমী শিক্ষক ও আচার্যগণই পারেন মানুষের সার্বিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে। এই বিরাট কাজে সমগ্র হিন্দুসমাজকে এক জোট হয়ে মনে প্রাণে উদ্দেশ্যের সততা নিয়ে নামতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকল্প—মন্দির নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ

দ্বিতীয় হচ্ছে—মন্দির নির্মাণ ও জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন প্রকল্প। হিন্দুসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মন্দির। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বহু বৈচিত্র্যময় দেবদেবীর মান্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন মন্দির নির্মাণ আবশ্যক। তাছাড়া দেশে অসংখ্য ছোট বড় মন্দির রয়েছে নিতান্ত পরিত্যক্ত ভগ্নদশায়। এ সব জীর্ণ মন্দিরের অবহেলিত বিগ্রহের চোখে যেন অশ্রু ঝরছে, ঐ মন্দিরের দেওয়ালগুলো যেন কাঁদছে। কেউ দেখার নেই। যে দেশে রাজনীতির তাড়নায় ধর্মই পরিত্যজ্য সে দেশে মন্দিরকে সংস্কার ক'রে ঝকঝকে করার কথা কে ভাববে? বিগ্রহের ব্যথা কে বুঝবে? পুরোহিতকুল না খেতে পেয়ে মরলে কার কী আসবে যাবে? অথচ পাশাপাশি দেশের মধ্যেই বিধর্মীদের উপাসনালয়গুলি ঝকঝক তকতক করছে। সেখানে ধর্মযাজকদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাকে সমীহ করছে হিন্দুরা। তাই ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ মন্দিরগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হবে সর্বভাবে। প্রাণের আকুতি দিয়ে বাজাতে হবে শাঁখ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা। নিয়মিতভাবে করতে হবে পূজা আরতি ও বিগ্রহ সেবা।

তৃতীয় প্রকল্প—সুযোগ্য পুরোহিত নির্মাণ

তৃতীয় হচ্ছে, পুরোহিত নির্মাণের প্রকল্প। সত্যিকার ভাল পুরোহিত সমাজের সার্বিক মঙ্গলের পুরোধা, তার স্থান শুধু যজমানের গৃহে নয়, সমাজেরও পুরোভাগে নিহিত। যজমানের হিত এবং সমাজের হিতসাধন যাঁর ব্রত, সেই ত্যাগ-সংযমনিষ্ঠ জ্ঞানী হৃদয়বান পুরোহিত প্রয়োজন হিন্দুসমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য। মন্ত্রোচ্চারণ ঠিকমত করতে পারেন, মন্ত্রের অর্থ ও পূজাদি ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং বিধিবৎ সব কিছু সম্পন্ন করতে পারেন, সেরকম পুরোহিত প্রয়োজন দেববিগ্রহাদির পূজা এবং অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের জন্য। পৌরোহিত্যকে আরও ব্যাপক আরও উপযোগী ক'রে তোলা যায় যদি পুরোহিতের মধ্যেই আচার্য এবং শিক্ষকের ভূমিকাকে সংযোজিত করা যায়। তাই পৌরোহিত্যের ক্ষেত্রে গুণগত মানকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। শুধু জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেই হবে না, সদ্‌ব্রাহ্মণের গুণ থাকা একান্তই আবশ্যক। যদি অন্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন মানুষের মধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণের গুণ থাকে, তাহ'লে তাঁর পৌরোহিত্য শিক্ষায় নিষ্ণাত হয়ে পুরোহিত হবার পথে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। এ সব বিষয়ে যতদূর সম্ভব একমত হয়ে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। তার জন্য হিন্দুসমাজকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মিলিত হতে হবে ঐক্যভূমিতে।

চতুর্থ প্রকল্প—সুসংস্কৃতির পুনরুত্থান

চতুর্থ হচ্ছে, সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের প্রকল্প। দেখা যাচ্ছে, ইদানীংকালে হিন্দুর নিজস্ব সংস্কৃতির উপর আছড়ে পড়েছে বিদেশী বিধর্মী

সংস্কৃতির বিরাট তরঙ্গ। এ সংস্কৃতি ভোগবাদী ভাবধারা আশ্রিত জৈবস্তরের সংস্কৃতি। অথচ হিন্দুর সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ভাবধারা এবং ধর্ম আশ্রিত দিব্যস্তরের সংস্কৃতি। হিন্দুর সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবনের সহায়ক চারপুরুষার্থের সমন্বয়, যার চরম ফল মোক্ষ। ত্যাগভিত্তিক জীবনদর্শনের সঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির রয়েছে অপূর্ব যোগ। আনন্দের মধ্যে রয়েছে পরমানন্দের দিকে গতি। তাই সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিচর্চার থাকবে একটি সুষ্ঠু সমন্বয়। শিল্প রসবোধ জাগাতে হবে ছাত্রাবস্থা থেকেই আর সংস্কৃতিকে মার্জিত করতে হবে জ্ঞানের আলোয়। এসব প্রধানতঃ হবে শাস্ত্র ভিত্তিক। নৃত্য, গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য অথবা, অঙ্কনকলা, মূর্ত্তি নির্মাণাদি শিল্পকলা, সব কিছুর উপাদানের উৎস হবে ভারতীয় ঋষিমুনিদের অবতার মহাপুরুষদের প্রজ্ঞা প্রসূত শাস্ত্র ও জীবনাদর্শ।

অথচ শতধাবিভক্ত হিন্দুসমাজের বর্তমান দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভোগবাদী ও ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতি আক্রামক ভঙ্গিতে অনুপ্রবেশ করছে ভারতে। সিনেমা, সাহিত্য, খবরের কাগজ, দূরদর্শন প্রভৃতি প্রচারমাধ্যম সকলেই কমবেশি একসুরে হিন্দুত্বকে ক্রমাগত কষাঘাত ক'রে ভোগবাদী সংস্কৃতির জয়গানে হয়েছে মুখর। এর ফলে তছনছ হয়ে যাচ্ছে জীবনপ্রণালী, ঢল নেমেছে সার্বিক অবক্ষয়ের। বিবেকবর্জিত দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু ক্ষমতাবান হিন্দুমুখোশধারী মানুষ সেই অবক্ষয়ের আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদ নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সংসারের শ্রী শান্তি দিব্যতা মাধুর্য আত্মীয়তা আতিথেয়তা দানধ্যান পূজাপাঠের পর্ব সবই উবে যাচ্ছে। শুধু ভোগের উপকরণ-সর্বস্ব যন্ত্রবৎ শুষ্ক জীবন থেকে যাচ্ছে।

হিন্দু বিবাহ একটি ব্রত। হিন্দু বিবাহ দুটি জীবনের চিরস্থায়ী আত্মিক মিলন যার উদ্দেশ্য গার্হস্থ্য আশ্রমের পুণ্য ব্রত উদ্‌যাপন। বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা হিন্দুসংস্কৃতি বিরোধী কথা। বর্তমানে বিদেশী ভাবধারা প্রসূত আইন কানুন হিন্দুদের বিবাহরূপী পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে দূষিত ও কলুষিত করেছে। বলা হয়েছে বিবাহ হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি চুক্তি বা কন্‌ট্রাক্‌ট। এই কন্‌ট্রাক্‌ট ভেঙ্গে দেওয়া যায় ডাইভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে। খ্রীষ্টানদের ডাইভোর্স আর মুসলিমদের তালাক কাল্‌চার হিন্দুদের পবিত্র সংস্কৃতির ওপর চেপে বসলো। হায়! এই কি ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ, না স্বাধীন ভারতের বিপথগামিতার রূপ! আজ সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মত ঘরে ঘরে বিবাহের পরই স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পতি পরমেশ্বর, পতি দেবতা, পত্নী সহধর্মিণী, সহমর্মিণী, এসব কথা গতদিনের গল্প হয়ে যাচ্ছে। এর ফল কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ওপর মারাত্মকভাবে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসব দিনরাত দেখছে শুনছে। প্রচার মাধ্যমগুলিও এই কাল্‌চারে ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাই হিন্দুদের বিবাহিত জীবনের স্থায়িত্ব এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক সুনিশ্চিত করার উপযোগী বিধি ব্যবস্থা প্রবির্তিত করা প্রয়োজন। এটার জন্য চাই ঋষি-প্রজ্ঞার দিক্‌নির্দেশে সময়োপযোগী বিধান নির্মাণ। পবিত্র গার্হস্থ্য আশ্রমের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিন্দুদের আত্মস্থ হয়ে ভাবতে হবে এবং একজোট হয়ে তৎপর হতে হবে।

ছোট পরিবারগুলিতে থাকছে না হৃদয়ের আদান-প্রদান। বাবা-মা রিটায়ার করলেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বৃদ্ধাবাসে। ছেলেমেয়ে বড় হলেই আলাদা হয়ে যাচ্ছে বাবা মা'র কাছ থেকে। শুধু বিচ্ছিন্নতার ছবি আঁকা

হচ্ছে ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির তূলিতে। ইতস্ততঃ ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু তার কোন দানা বাঁধা রূপ চোখে পড়ছে না।

হিন্দুসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপের একটি অপরিহার্য অঙ্গ যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার ত্যাগস্বীকার, তিতিক্ষা, সহানুভূতি, উদারতা, সেবা প্রভৃতি মহৎ গুণের অনুশীলন-ক্ষেত্র। বাবা, মা কাকা, জ্যাঠা, কাকীমা, জেঠিমা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমার সঙ্গে ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনীদের নিয়ে যে পারিবারিক ছবিটি ফুটে ওঠে তার মাধুর্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি অনভিজ্ঞ। তাই যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে ধরে রাখা হিন্দুদের অবশ্য কর্তব্য।

ভারতীয় ঋষিরা মনুষ্য জীবনকে চার অধ্যায়ে ভাগ করে একটি সুপরিকল্পিত দিশা দিয়েছিলেন। সেই চার অধ্যায়কে বলতে পারি চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গুরুকুলের পদ্ধতিতে সুশিক্ষা লাভ করে তাকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে। তারপর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম ও কর্তব্য শেষে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ অর্থাৎ স্বেচ্ছাবসর গ্রহণপূর্বক জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অবশিষ্ট কর্মশক্তিকে দেশের ও দশের কাজে নিয়োজিত করতঃ আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হওয়া। তারপর একসময় সর্বত্যাগ ও সন্ন্যাস জীবন যাপন। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে চার পুরুষার্থের পূর্ণতা। এই ব্যবস্থা ভারতীয় জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। এগুলি ফিরিয়ে আনতে হবে।

মাতৃজাতির পূর্ণাঙ্গ উত্থান

সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানে মাতৃজাতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মায়েদের প্রকৃত রূপ জগদ্ধাত্রী রূপ। তাঁরা হাল না ধরলে ভরাডুবি ছাড়া

আর কী হবে! তাই হিন্দুনারীকে তাঁর যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। নারী একাধারে গৃহলক্ষ্মী ও গৃহকর্ত্রী এবং মাতৃত্বের মমত্বে স্নেহে ভবিষ্যৎ সন্তানের পালয়িত্রী। হিন্দুসমাজে নারীর রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। আবার কতর্ব্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রজন্মকে গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্বও প্রধানতঃ মাতৃজাতির কাঁধেই ন্যস্ত। তাই হিন্দুনারীর মধ্যে হিন্দুত্বের চেতনা, নিষ্ঠা, গৌরববোধ ও ঐক্যভাবনা বিশেষভাবে জাগাতে হবে।

নারী স্বাধীনতার ধূয়া তুলে আজ নারী পুরুষ সকলে মিলে নারীজাতিকে ঠেলে দিচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে। নারী হ'য়ে উঠছে পুরুষের ভোগমুখী দৃষ্টির একটি উপকরণতুল্য। বিদেশী চাকচিক্য ও প্রচার-পদ্ধতির মোহে আবিষ্ট ভারতীয় নারীর মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে। তাই আজ সমাজদেহে আপতিত বহু ধরণের সাংস্কৃতিক আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে নিজস্ব মহিমান্বিত সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নারীপুরুষ বালকবৃদ্ধ সহ সমগ্র হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।

পঞ্চম প্রকল্প—দেশব্যাপী নামকীর্তন প্রবর্তন

পঞ্চম হচ্ছে, দেশব্যাপী নিয়মিত নামসংকীর্তন প্রবর্তন প্রকল্প। দেশ জুড়ে যদি আমরা মহাপ্রভুর কর্মপন্থা অনুসারে নামকীর্তন প্রবর্তন করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে, হিন্দুদের ভিতরে প্রতি প্রভাতে সামূহিকরূপে বেজে উঠবে মিলন মাঙ্গলিক। নিয়মিত পথপরিক্রমা সহ প্রভাতী নামকীর্তনে বহু উপকার সাধিত হয় একই সঙ্গে। শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্থৈর্য, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি একই সঙ্গে লাভ করা যায় প্রভাতী নামসংকীর্তনে। এর জন্য দেশজোড়া কর্মসূচী গ্রহণ করতে হিন্দুর ঐক্য অনিবার্য প্রয়োজন।

ষষ্ঠ প্রকল্প—বহুমুখী গবেষণার প্রবর্তন

ষষ্ঠ হচ্ছে, বহুমুখী গবেষণার প্রবর্তন প্রকল্প। আজ সর্বজ্ঞানের আকর 'বেদ' লুপ্তপ্রায়। বৈদিক ঋষির অখণ্ড পরম্পরা আজ ভারতবর্ষে দুর্লভ। বেদ ব্যাখ্যাতা, বেদের যথার্থ বেত্তা, বেদের যাগযজ্ঞে পটু, সর্ববিধ ক্রিয়াকাণ্ডের জ্ঞাতা খুবই বিরল। তবু যাঁরা নৈষ্ঠিকভাবে বংশপরম্পরায় নিজ নিজ শাখার বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছেন, তাঁদের প্রতিও দেশের মানুষের কোনও দৃষ্টি নেই। বিদেশীরা আগেও নিয়ে গেছে আমাদের বহু মূল্যবান শাস্ত্র, আজও নিয়ে যাচ্ছে অবশিষ্টটুকু। আমরা রাজনৈতিক কলহে লিপ্ত, ধনলোভে মত্ত, ধর্মবর্জনে ব্যস্ত, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তায় মগ্ন এবং আলস্যে আচ্ছন্ন থেকে আধুনিকতার তকমা এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই বিরাট অবহেলার ফলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বিদেশী শাসনের দীর্ঘ সহস্র বৎসর ধরে আমাদের মৌলিক রিসার্চ বা গবেষণার সূত্র ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ফলে বেদাদি শাস্ত্রে বিজ্ঞানের যে চিরসত্য তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে, তার প্রয়োগ আমরা সমাজের কল্যাণে করতে পারছি না। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই বেদ থেকে উদ্ভুত এ কথা অত্যুক্তি নয়। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে ভারতের আয়ুর্বেদে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বের বাজারকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সমর্থ। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে বিশাল বহুমুখী গবেষণা প্রয়োজন, তার মহৎ প্রকল্প রূপায়ণ তখনই সম্ভব হবে, যখন বিশ্বের সমস্ত হিন্দু তাদের সদিচ্ছা ও শক্তিকে একত্রিত ক'রে প্রয়োগ করবে।

এসব হচ্ছে কয়েকটি বড় আকারের সামূহিক কর্মপ্রকল্পের দৃষ্টান্তস্বরূপ সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র। এর জন্য চাই মাস্টার প্ল্যান এবং তার রূপায়ণেব

বাস্তব লক্ষ্যবিন্দু। মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্য বিন্দুকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ক'রে, স্থান-কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, ধাপে ধাপে রূপায়িত করার জন্য দেশ-জোড়া নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন সমভাবাপন্ন কার্যরত বা কার্যক্ষম ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির মধ্যে গড়ে তুলতে হবে সমন্বয়। বিশ্বের তাবৎ হিন্দুর সাধ্য সামর্থ্য মত অবদান থাকা চাই এসব প্রকল্পের রূপায়ণে।

এত সব করার আছে। এখন কি ছোট ছোট তুচ্ছ বিরোধ, ঝগড়া, মন কষাকষি সাজে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে? এখন কি সাজে কোটির পর কোটি টাকা জমিয়ে আরও কোটি কোটি টাকার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকা। এখন কি সাজে সত্যকে না ধরে শুধু মিথ্যার ফানুস ওড়ানো খেলা? আবহমান কাল ধরে হিন্দুরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য জাতি, wholly developed country, পূর্ণ বিকশিত দেশ, first world—বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃথিবী, অথচ তাদের আজ বলা হচ্ছে developing country, উন্নয়নশীল দেশ, third world, তৃতীয় পৃথিবী— এ অপবাদ সহ্য করা কি হিন্দুর সাজে! তাই সর্বভাবে হিন্দুর স্বাভিমান রক্ষার জন্য গুরু-শিষ্য, শিক্ষক-ছাত্র, ধনী-দরিদ্র, বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবী, পুরুষজাতি-মাতৃজাতি, উচ্চাবচ নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুকে হতে হবে সাবধান, সচেতন এবং সক্রিয়।

নিয়মনিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও বাধ্যতা

এই সাবধানতা ও সচেতনতার প্রথম সোপান হচ্ছে প্রত্যেক হিন্দুর জীবনে নিজস্ব ধর্মাচরণের নিষ্ঠাকে কার্যকর করা। কারণ, হিন্দু পরিচয়টা জীবনচর্যার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর। ইষ্টনিষ্ঠা এবং নিয়মনিষ্ঠা ব্যতীত ব্যক্তিজীবন গঠন হয় না। শুধু জন্মসূত্রে হিন্দু, অথচ শিক্ষায় খ্রীষ্টান,

সংস্কৃতিতে মুসলমান, তাকে আমরা যথার্থ হিন্দু বলতে পারি না। সারা বিশ্বের কোটি কোটি হিন্দু যদি তাদের ব্যক্তিজীবনে আলাদা আলাদা ভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়গত মান্যতা অনুসারে হিন্দুজীবনপ্রণালীকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখে, তাহলে তাদের ভেতর ভাবগত ঐক্য সহজেই আনা যায়। বৈচিত্র্যময়তা সেক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। কারণ, তার মধ্যে মৌলিক কোনও বিরোধ নেই, অথচ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আছে মৌলিক ঐক্য। শুধু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার মূলভূত কারণ ও প্রয়োজন পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে প্রত্যেক হিন্দুকে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে মনে ক'রে আমরা সেই তথাকথিত স্বাধীনতাকে উপভোগ করায় মেতেছি। এই মাতন প্রায় উচ্ছৃংখলতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিশেষ ক'রে হিন্দুজাতি যেন শেকল ছিঁড়ে ছুটতে চায়, এমনই অবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ স্ব-অধীনতা আর ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির নিজস্বতা এবং আত্মপরিচয়ের স্বত্ব ধর্মেই নিহিত। তাই স্বধর্ম পালন স্বাধীনতার পূর্ব সর্ত। ইষ্টনিষ্ঠা এবং নিয়মনিষ্ঠাই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ধর্মানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া হিন্দুজাতি দাঁড়াতে পারে না।

স্বধর্ম নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রত্যেক হিন্দুকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে হিন্দুজীবনপ্রণালী। তার সকাল থেকে রাত্রি, বাল্য থেকে বার্ধক্য, সবরকম নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্মই হবে তার সম্প্রদায়গত হিন্দু ধর্মানুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে মতপথের ও সম্প্রদায়ের। নিজ নিজ ধর্মপথের ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় বজায় থাকবে। কিন্তু নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ফুটে উঠবে কিছু সাধারণ আচরণবিধি যা তাকে হিন্দুত্বের সামগ্রিকতার সঙ্গে যুক্ত রাখবে।

প্রত্যেক হিন্দুকে স্বধর্মপরায়ণ হতে হবে, ধর্মবিমুখ হওয়া চলবে না। প্রতিদিন নিয়মমত ত্রিসন্ধ্যা নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ, আহ্নিক, প্রার্থনা করতে হবে। নিজ নিজ ধর্মাচার্যদের নির্দেশ অনুযায়ী আহ্নিক বিধিতে গৌণ কিছু তফাৎ থাকলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু জপই হোক, প্রার্থনাই হোক, একটা কিছু তাকে করতে হবে নিয়মমত এবং সময়মত। মাঠঘাট, দোকানপাট, কোর্টকাছারি যেখানেই হোক না কেন, মুসলমানগণ তাঁদের মতো ক'রে নিয়মমত পাঁচবার অথবা তিনবার ঠিক সময়ে নামাজ নিবেদন করেন। সেটাতে লজ্জার কোনও কারণ আছে বলে তাঁদের মনে হয় না। বরং তাঁরা এটা সগৌরবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠান করেন। আমরা হিন্দুরাও তাঁদের এই অনুষ্ঠানকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখি, বলি, এবং তাঁদের নির্বিঘ্ন অনুষ্ঠানের সুযোগও ক'রে দিই। অথচ হিন্দুগণ নিজেদের ধর্মাচরণে নিষ্ঠার প্রকাশকে লজ্জা ও সংকোচের বস্তু মনে করেন। এটা অদ্ভুত ব্যাপার!

আধ্যাত্মিকতার গভীর সাধনা মনে বনে কোণে অনুষ্ঠেয় ঠিকই। কিন্তু সর্বসাধারণের সমবেত ও প্রকাশ্য অনুষ্ঠানও পাশাপাশি অপরিহার্য। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির ধর্মানুষ্ঠানের একাংশ যুক্ত হলে উভয়তঃ লাভ বৈ ক্ষতি নেই। তাই যে যেখানেই থাকুন, নিয়মমত ঠিক সময়ে ত্রিসন্ধ্যা জপ প্রার্থনা এবং সম্ভবমত আহ্নিক ইত্যাদি অনুষ্ঠান করবেন, এটা আবশ্যিক হওয়া দরকার।

প্রভাতী নামসংকীর্তন মণ্ডলীতে যোগ দেওয়া, নিকটস্থ মন্দির বা আশ্রম বা গুরুস্থানে প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে দুদিন কিংবা অন্ততঃ একদিন অবশ্যই যাওয়া অনিবার্য কর্তব্য বলে গণ্য হওয়া দরকার।

সন্ধ্যায় বাড়িতে বাড়িতে ভজন, গান, নাম, শাঁখ, কাঁসরঘণ্টা ইত্যাদি

সহ আরতি করা, তুলসীতলায় জল দেওয়া, প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ মান্যতা অনুযায়ী অবশ্য পালনীয়।

প্রতিদিন নিয়মিত কিছুক্ষণ এবং সপ্তাহে একদিন বিশেষভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা গৃহে গৃহে প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এই স্বাধ্যায়ের অভাবে আজ হিন্দুরাই হিন্দুত্ববোধশূন্য হয়ে পড়েছে। তাই পাঠচক্রের মাধ্যমে শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রার্থ ভিত্তিক আলোচনা সভা অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের তত্ত্বগুলির পার্থক্য ও বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। ইদানীং হিন্দুদের শাস্ত্রচর্চার অভাবে ধর্মবিষয়ে জ্ঞান একেবারেই আচ্ছন্ন থেকে যায়। যে যা বলে তাই শুনে একটা ধোঁয়াটে ধারণার বশবর্তী হয়ে ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে তারা। এখন তো খবরের কাগজই হয়ে গেছে জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টি.ভি। এর কুপ্রভাব কাটাতে ঘরে ঘরে নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রপাঠ হওয়া চাই অনিবার্য্য। ছোটবেলা থেকেই সকলের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহ সঞ্চার করা প্রয়োজন এবং তার জন্য পরীক্ষা, প্রশ্নমঞ্চ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিও আয়োজন করা প্রয়োজন।

ঘরে ঘরে শাস্ত্রচর্চার প্রবর্তন

ঘরে ঘরে প্রচলিত এই জ্ঞানচর্চার বিষয় হবে সরকারি শিক্ষাক্রমের পরিপূরক। এতে থাকবে পরিবারের বা ব্যক্তির নিজ নিজ সম্প্রদায়গত নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুত্বের সমগ্রতার উপলব্ধির ব্যবস্থা, যাতে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা নিজেদের একটি মহাজাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে জানতে পারে। তারা যেমন নিজের সম্প্রদায়গত পরিচয়ের বিশিষ্টতাকে গৌরবের বিষয় বলে জানবে, তেমনি তাদের হিন্দুত্বের বিরাট

পরিচয়কেও সমান গৌরবের বিষয় বলে জানবে। শুধু একাংশের জ্ঞান নয়, পূর্ণতার জ্ঞান যাতে সঞ্চারিত হয়, সেদিকে প্রথম থেকেই দৃষ্টি রাখতে হবে।

দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা আবশ্যক

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি বিবিধ সংস্কারকর্মে হিন্দুধর্ম-নিষ্ঠাকে রক্ষা করা হিন্দুদের অনিবার্য কৃত্য। হিন্দুদের বিবাহ কোনও সাধারণ চুক্তি নয়। এটা একটা ধর্মীয় সংস্কার এবং পবিত্র ব্রত। বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা হিন্দুধর্মের কথা নয়, সেমেটিক ধর্ম ও পাশ্চাত্যসংস্কৃতির কথা। শ্রাদ্ধ তর্পণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আছে স্বকীয় মাহাত্ম্য। এগুলি যথাবিধি অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

হিন্দুদের বেশভূষায় জামাকাপড়ে বিদেশীয়ানার ছাপ বর্জন ক'রে ভারতীয় বিশেষত্ব ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। মা বাবা আত্মীয়স্বজনদের সম্বোধনের ক্ষেত্রেও বিদেশী শব্দের স্থলে মাতৃভাষার শব্দ প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য। কাউকে স্বাগত জানাতে বা বিদায় জানাতে বিদেশী শব্দের স্থলে নিজের দেশের শব্দ প্রয়োগ অবশ্য করণীয়।

জন্মদিন পালনের ক্ষেত্রে বিদেশী ভাবধারার যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা সর্বথা বর্জনীয়। হিন্দুদের গৃহে জন্মদিনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে ফেলে কেক কাটার অনুষ্ঠান নয়। এটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনের জ্যোতি ও জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বলতর করার বিধান। ধানদুর্বা দিয়ে 'শুভ জন্মদিন মঙ্গলময় হোক' বলে আশীর্বাদ ও মঙ্গল প্রার্থনা সহ দেবতার পূজা ভোগ ও পায়সান্ন প্রসাদ যেন বয়ে আনে দেবতার প্রসন্নতা। তাই এগুলি নিজস্ব বিধিতেই অবশ্য পালনীয়। সবাই

এগুলি বাধ্যকরীভাবে মেনে চললে জাতি হিসাবে হিন্দুর অস্তিত্ব সহজেই চোখে পড়বে।

হিন্দুদের অন্যান্য কিছু করণীয়

তাছাড়াও কিছু কিছু আচার-আচরণে বজায় রাখতে হবে এমন সাদৃশ্য যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও তারা যে এক হিন্দুজাতির অন্তর্গত সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন, ওঁ-কার এবং স্বস্তিক চিহ্নের ব্যবহার, ঘটস্থাপন, আলপনা দেওয়া, তিলক করা, ওঁকার বা ইষ্টমূর্তি সম্বলিত লকেট পরা ইত্যাদি।

হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ অপপ্রচারের প্রতিবাদ এবং সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য। হিন্দুদের ধর্মভাবে আঘাত দিলে সেটা সহ্য করা কোনও হিন্দুরই উচিত নয়। হিন্দুজাতির নিজস্ব অস্মিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বীর্য বল তেজ ও মন্যুর প্রকাশ অনিবার্য প্রয়োজন। সহনশীলতা ও উদারতার একটা ক্ষেত্র আছে, একটা সীমা আছে। কাপুরুষতা ও ভীরুতাই পাপ। তাই ধর্মে হাত পড়লে অবশ্যই গর্জে উঠতে হবে, প্রতিকার করতে হবে। কারণ, ধর্মই হচ্ছে হিন্দুজাতির প্রাণ। অতএব মহান্ হিন্দুধর্মের ওপর সংকীর্ণ ভোগবাদী স্বার্থসর্বস্ব গোষ্ঠীর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে, তাকে প্রতিহত করতে সম্প্রদায়ের গণ্ডী পেরিয়ে সমগ্র সচেতন হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস করতে হবে।

হিন্দুদের বিপদে আপদে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য করণীয়। এখন ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্লিষ্ট হিন্দুরা পাশের বাড়ির খবর নেয় না, পাশের লোক অসুবিধায় পড়লে ফিরে তাকায় না। কিন্তু সে ভুলে যায়, তারও এমনি কোনও প্রয়োজন একদিন হতে পারে।

হিন্দুদের মন্দিরনির্মাণ, মন্দির সংস্কার অথবা ধর্মমূলক, শিক্ষামূলক,

সংস্কৃতিমূলক, সেবামূলক সব শুভ প্রকল্পকে যথাসাধ্য সাহায্য দান ও সহযোগ দান প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য। বহু মানুষের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ ছাড়া বড় বা মহৎ কিছু গড়ে তোলা যায় না। তাই এসব কাজে সকল হিন্দুর সহানুভূতিযুক্ত হয়ে নিঃস্বার্থপ্রাণে এগিয়ে আসা দরকার।

হিন্দুধর্ম প্রচারে বিশেষ সতর্কতা ও মিলনভূমি রচনা

হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণ ও আগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী ধর্মাচার্য বা ধর্মসংস্থা দেশে ও বিদেশে হিন্দুধর্মপ্রচারে নিয়োজিত আছেন এবং যাঁরা প্রচার কার্যে যুক্ত হতে আগ্রহী, তাঁদের সকলের ভেতরেই একটা সমন্বয় ও ঐক্যের সুর গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাব ও মত-মতান্তর থাকুক, বৈচিত্র্য থাকুক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই যে হিন্দুধর্মের একই মূল থেকে উদ্ভুত এবং একই মূল উদ্দেশ্যে নিযুক্ত, তাঁরা যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মহাসংঘবদ্ধ, একথা যেন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত ও অভিব্যক্ত হয়। এর জন্য যে ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্মের প্রচার প্রসারের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদের একটা উচ্চপর্যায়ের বিশেষ প্রশিক্ষণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সব ধর্মসম্প্রদায়ের ঐক্যভূমি থেকে সেই সব সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুসন্তদের প্রতিনিধি বর্গকে নিয়েই গঠিত হবে উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষকমণ্ডলী। এ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয় মর্যাদার বিন্দু। ছোট ছোট সেন্টিমেন্টকে দূরে সরিয়ে, স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতির কথা সর্বোপরি সম্মুখে রেখে এসব অতি সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

এছাড়াও এখন প্রত্যেক হিন্দুকেই হতে হবে হিন্দুজাতির এবং হিন্দুধর্মের মুখপাত্র। এর জন্য চাই স্বদেশ তথা স্বধর্মের সমগ্র সত্তার সঙ্গে

নিখাদ একাত্মতা। এরকম একাত্মতার অনুভূতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এই মহান্ জাতির প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়।

দেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই হিন্দুমাত্রই যাতে স্বজাতির ও স্বধর্মের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা ও বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ তৈরি করতে হবে কিছু সাধারণ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ প্রণালী। বিদেশে যে সব হিন্দুগণ স্ব স্ব কর্মব্যপদেশে যাওয়া আসা করেন, তাঁরাও কিন্তু হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হন। হিন্দুস্থানের যে সব পদাধিকারী বিদেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিযুক্ত থাকেন রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরূপে, তাঁদের দায়িত্ব ধর্মাচার্যদের চেয়ে কিছু কম নয়। তাই তাঁদের প্রশিক্ষণে সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দুত্বের পূর্ণাংগ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা থাকা বিশেষ আবশ্যক। বর্তমানে যা চলছে তা কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বিদেশী দাসত্বের মনোভাবে সম্পৃক্ত হিন্দুধর্ম বিষয়ে জ্ঞানহীন নিষ্ঠাহীন এবং হিন্দুত্ব বিরোধীরাই এ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তাই বিদেশীদের কাছে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুজাতি ভিখারি ক্রীতদাসদের মতোই অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের বস্তু। এই দুরবস্থার হাত থেকে দেশ এবং জাতির সম্মানকে উদ্ধার করতে এবং হিন্দুর স্বাভিমানকে ফিরিয়ে আনতে হিন্দুদেরই করতে হবে সর্বতোমুখী প্রস্তুতি। এই সব বিষয়কে ঠিকভাবে প্রয়োগ ও পরিচালনার জন্য বিশ্বের হিন্দুকে ঐক্যভূমিতে সম্মিলিত হতে হবে।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বকে ঝেড়ে ফেলতে হবে

আমরা সবাই দেখছি ও বুঝছি এবং হাড়ে হাড়ে টেরও পাচ্ছি, কীভাবে অর্থনৈতিক দাসত্ব এবং সাংস্কৃতিক দাসত্বের দিকে গুটিগুটি পায়ে

এগিয়ে যাচ্ছে হিন্দুসমাজ। ভোগবাদী তত্ত্ব ও শিক্ষা-সংস্কৃতির আপাত চাকচিক্যের আকর্ষণে ও মোহে সংযমের বাঁধগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। টাকার জন্য সব করতে পারে আজকের ভারতের মানুষ। বিবেক তাকে আটকাতে পারছে না। কারণ শিক্ষা এবং সংস্কৃতি থেকে বিবেকের উৎসস্বরূপ হিন্দুধর্ম বিসর্জিত হয়েছে দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে। দেখতে দেখতে কয়েকটি প্রজন্মকে ধর্মচেতনার স্থানে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র অর্থচেতনা এবং নিজের কেরিয়ার-সর্বস্বতার চেতনা। এই শিক্ষায়, এই অপসংস্কৃতির আধুনিক প্রবাহে, এই সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা এবং অর্থসর্বস্বতাময় জীবনদর্শনে যে দেশ, যে জাতি গড়ে উঠছে, তার পক্ষে স্বাধীনতার বোধ বা আত্মপরিচয়ের মর্যাদাবোধ যেন অর্থহীন। বিদেশী শক্তিরাও সহাস্য বদনে দূর থেকে দেখছে স্বরাজ নামক খেলনা পেয়ে কেমন সুন্দর দাসত্বের শৃঙ্খল পরে খোঁটায় বাঁধা পালিত পশুর মতোই, ছেড়ে দেওয়া দড়ির পরিধির মধ্যে, খেলছে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাতির নব প্রজন্ম। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাজগতে পরাধীনতাকে যারা কবুল করে নিয়েছে তাদের রাজনৈতিকভাবে পরাধীন করার তো কোনও প্রয়োজন নেই। কেন মিছে সেই ঝুঁকি নিতে যাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর দল! অতএব এই স্বাধীনতার ছদ্মবেশে যে ঘোর পরাধীনতা হিন্দুজাতিকে ক্রমাগত শৃঙ্খলিত ক'রে চলেছে, তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আজ বিশ্বের তাবৎ সচেতন হিন্দুকে একত্রিত হতে হবে, সংগঠিত হতে হবে এবং সুচিন্তিত কর্মপন্থা অবলম্বন ক'রে লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষকে ভাবতে হবে নিজস্ব অর্থনীতির কথা। হিন্দু অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ কৃষি, গোরক্ষা এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প। ভারতেব

ঋষিরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। তাঁরা প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে আবিষ্কার করেছিলেন মানুষের প্রয়োজনের সব রকম বস্তু। সব কিছুর গভীর নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের পর প্রকৃতির দানের যথার্থ প্রয়োগ ও উপযোগের বিধি বিধান দিয়েছিলেন। গ্রাম ছিল অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এবং সম্পদের উৎস। আজ ইকলজি বিপন্ন বলে চীৎকার করছি আমরা। কিন্তু ঋষিরা সেই ইকলজির এতটুকু ক্ষতি না করে, ভারসাম্য নষ্ট না করে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে চলার পদ্ধতি বলেছিলেন। তাতে সর্বজনের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল বিহিত ছিল। গব্যঘৃত-সমৃদ্ধ যজ্ঞধূমের আকাশে গিয়ে মেঘের সঙ্গে সংমিশ্রণ, তারপর বৃষ্টির জলের মাধ্যমে মাটিতে সেই রসায়নের রসসিঞ্চন, কৃষিজাত সকল ফসলকে করতো গুণমানে উন্নত, সুস্বাদু ও স্বর্গীয় সুরভিমণ্ডিত। গোবর শ্রেষ্ঠ সার বলে গণ্য হ'ত। গোমূত্র কীটনাশক ও বহুবীজাণুর ঔষধিরূপে ব্যবহৃত হ'ত। ভারত আজও দেশের একশভাগ মানুষকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যদি কৃষি, গোরক্ষা এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ে গ্রামভিত্তিক জীবনচর্যাকে পুনরুজ্জীবিত করে। এর সঙ্গে ভোগ এবং ত্যাগের সমন্বয়ে জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলে সমবণ্টন ও প্রকৃত অর্থে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারে না।

হিন্দুদের ধর্ম-দর্শন জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করার বিধানই দিয়েছে। জীবনমুখী এই দর্শন সমস্ত মানুষের জন্য। তাই দৈন্য দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ হিন্দু-অর্থনীতিই দেখাতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক ভোগসর্বস্বতা, মুনাফার দ্বারা টাকার পাহাড় নির্মাণ অথবা অপরের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করে পরস্বাপহরণের মধ্য দিয়ে অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। অন্ততঃ

হিন্দুধর্ম-দর্শনের বিচারে মানুষ পশুপ্রবৃত্তির মধ্যে সীমিত জন্তুমাত্র নয়, তার জীবনের মূল্য অনেক উচ্চ, অনেক সূক্ষ্ম, অনেক উদার। মানুষই হতে পারে দেবতা, মানুষই হতে পারে ভগবান। তাই স্থূল জাগতিক মূল্য বা টাকা ইত্যাদি ঐশ্বর্য তার কাছে হয়ে যায় তুচ্ছ। অথচ বিদেশী ভাবধারার প্রভাবে আজ মানুষের চিন্তা শুধুমাত্র বস্তুবাদ ও ভোগবাদের পর্যায়েই এসে থেমে যাচ্ছে। ভারতের হিন্দুদের অর্থনৈতিক দর্শন পূর্ণাঙ্গ জীবনের দর্শন। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে বাস্তবে, ঋষি-প্রজ্ঞার নির্দেশ উপদেশ অবলম্বন ক'রে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হবে যথার্থ স্বাধীনতা

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম বর্জিত সেক্যুলার সংবিধানের কাঠামোতে সত্যিকার স্বাধীনতার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। সোজা ভাষায় বলতে গেলে সর্বপ্রথম নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সেক্যুলারিজমকে এবং সর্ব বিষয়ে ভিত্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে প্রকৃত ও যথার্থ হিন্দুত্বকে। নইলে স্বাধীন ভারতবর্ষ কথাটাই নিরর্থক হয়ে যাবে। বৈষম্য, তোষণ, জাতিভেদ, বিদেশী ভাবধারার দাসত্ব এবং হিন্দুজাতিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করার সব ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে এই সংবিধানে। শুধুমাত্র বিদেশী শাসককে তাড়ানোই স্বাধীনতা নয়। বিদেশী শৃঙ্খল মোচনে দেশ কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে, স্ব-অধীন হয় নি। স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সার্বিক সুরক্ষা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় চেতনার জাগরণের ওপর। ভারতবর্ষে উদার হিন্দুচেতনাই এই রাষ্ট্রীয় চেতনা। তাই রাষ্ট্র সঞ্চালন শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুকে করতে হবে হিন্দুধর্মাশ্রিত। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে, সংস্কৃতি চর্চার এবং জীবন চর্যার সর্ব স্তরে হিন্দুধর্মাশ্রিত রাষ্ট্রচেতনার জাগরণকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

দেশের সুরক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনে অস্ত্রধারণও অনিবার্য হয়ে ওঠে। হিন্দুদের দেবদেবীর হাতে অস্ত্র এবং সেই অস্ত্রের পূজা এই সিদ্ধান্তেরই প্রতীক। সারা বিশ্বের পটভূমিতে যথেষ্ট উপযুক্ত আধুনিকতম অস্ত্রভাণ্ডার প্রস্তুত রাখা রাষ্ট্রনেতাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে হিন্দুদের হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। গুরুকুলের শিক্ষা-পদ্ধতিতে ক্ষত্রিয়দের বিশেষভাবে অস্ত্রশিক্ষা এবং অস্ত্র প্রয়োগের বিধি ও বিধান বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন ঋষি মুনি আচার্যগণ। আত্মরক্ষা প্রথম ধর্ম, প্রথম কর্তব্য। দেশকে রক্ষা করার জন্য শক্তিধর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সারা পৃথিবীই শক্তের ভক্ত নরমের যম। তাই ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়াতে হবে দেশের রাজাকে। বিদেশীরা কতটা পিঠ চাপড়ালো সেটা সাফল্যের নিরীখ নয়। বিশ্বের শ্রদ্ধা কতটা আদায় করতে পারা গেল সেটাই সাফল্যের নিরীখ।

আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতবর্ষের এক গুরুতর সমস্যা। হিন্দু মুসলমান ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পরেও বিরাট সংখ্যায় মুসলমানরা ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতেই রয়ে গেল। তাদের জন্য নির্ধারিত দেশের টুকরো করা ভূখণ্ডে তারা গেল না। জনসংখ্যার আদান প্রদান দ্বিজাতি ভিত্তিতে হল না। তথাকথিত স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ কেবল মাত্র হিন্দুদের বলা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা, ছোট পরিবার সুখী পরিবারের কথা। পাশাপাশি মুসলমানদের যথেচ্ছ বংশবৃদ্ধি অনুমোদিত বাস্তব। ফলে স্বাধীনোত্তর ভারতের জনসংখ্যা এক অদ্ভুত বিষম পরিস্থিতির সম্মুখীন। সাধারণ হিন্দুদের মনে স্বভাবতই নানা প্রশ্ন জাগছে। দেশের ভিতরে আবার তৈরী হচ্ছে ফাটল। ফলে দেশ কি আর-একবার খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে? এই সাংঘাতিক বৈষম্যকে অবিলম্বে দূর করতে হবে। নতুবা এর পরিণাম

হিন্দুজাতির পক্ষে হবে ভয়ঙ্কর। ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথা শুধু বলা হয়, কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হয় না। ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে বসবাস করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককেই মেনে চলতে হবে হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল অনুশাসন, যাতে দেশব্যাপী সাম্যের সৌম্য বাতাবরণ তৈরী হতে পারে এবং এটা দেখা দেশনায়কের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব একটা আত্যন্তিক লক্ষ্য থাকে, একটা জীবনদর্শন থাকে। ভারতবর্ষ এ বিষয়ে সারা পৃথিবীতে অনন্য। পৃথিবীর সর্বত্র ভোগবাদ, বস্তুবাদ এবং জাগতিক সুখবাদের একচেটিয়া প্রাধান্য। কিন্তু ভারতবর্ষের আত্যন্তিক উদ্দেশ্য ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা। এই উদ্দেশ্যের উপলব্ধির জন্য ঋষিরা দিয়েছেন মূল্যবোধ জাগরণের মূল্যবান উপদেশ। মূল্যবোধ বলতে বোঝায় বিশেষ কতকগুলি মানবোচিত গুণ। যেমন—বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সততা, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ, সমাজসেবা, সত্য কথা বলা, কথায় কাজে মিল রাখা, লোভের সীমা রাখা, ক্রোধ-হিংসা সংবরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক আজ সর্বজনহিতকর এই সব মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে কোথাও চরিত্র গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সব মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেই। মানুষ ভোগবাদ এবং ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে দুর্বার ছুটছে। প্রজন্মগুলি পশ্চিমী ভাবধারার দাসত্ব স্বীকার করে শুধু ডিগ্রী এবং কেরিয়ারসর্বস্ব জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বড় হচ্ছে। দেশে প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষাপদ্ধতির এটাই অবদান।

আসলে গোড়ায় কিছুটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ব্রিটিশ চলে যাও' অনিবার্য হলেও একটা নেতিবাচক প্রস্তাব। ব্রিটিশ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু শূন্য স্থান পূরণ করা হবে কিভাবে? যারা

শাসন দণ্ড হাতে নেবে তাদের গঠনমূলক বিকল্প কর্ম পরিকল্পনা কি হবে? কিসের জন্য ব্রিটিশ তাড়ানো? শুধু কি স্বরাজ বা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর? তাও শর্ত সাপেক্ষে? সেই শর্তগুলির দস্তাবেজ এই সংবিধান যা প্রচ্ছন্ন পরাধীনতারই দলিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেই একটা কথা বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে—স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি গঠনমূলক উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক কর্মপ্রকল্প পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়নি। সেই উদ্দেশ্য দেশের মূল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নির্ধারণ করলে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কর্তব্যও নির্ধারিত হয়ে যেতো। সেই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ করতে পারবে সেই হবে এ দেশের রাজা। উদ্দেশ্য ভারতের মুনি ঋষিরা বলে দিয়ে গেছেন। ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের এবং দেশের সর্বস্তরের সর্বক্ষেত্রের উদ্দেশ্য ঋষিরা স্পষ্ট করে বলেছেন, যা আজও পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। ধর্মের ছত্রছায়ায় প্রজাপালনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখিয়ে দিয়েছেন রঘু, দিলীপ, দশরথ, জনক, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত, শিবাজীর মত রাজা মহারাজারা। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বরকম উপদেশ বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি আজও সম্পূর্ণ উপযোগী। ভারতবর্ষরূপী মহান রাষ্ট্রের নিজস্ব পরিচয়ের একটা বিরাট গৌরব আছে। সে গৌরব হিন্দুজাতির বহুমুখী গুণের উৎকর্ষের মধ্যে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছে চিরকাল।

আজ ধর্মনিরপেক্ষতার সূত্র ধরে ধর্মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা দানা বেঁধেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বস্তুনিষ্ঠ ভোগসর্বস্ব স্বার্থচিন্তা, দলভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তা, অপরাধ, দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও শোষণভিত্তিক অপশাসনের ব্যবস্থা নিষ্পেষিত করছে গ্রাস করছে তথাকথিত স্বাধীন

ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অসহায় নাগরিককে। মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ, রাজনেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তো সাধারণ মানুষ প্রাণধারণ করে, দৈনন্দিন জীবনের আশা আকাঙক্ষা পূরণের চেষ্টা করে। নৈতিক মূল্যবোধযুক্ত আদর্শ চরিত্র নির্মাণের কোনও প্রয়াসই আন্তরিকভাবে করা হয়নি, এমনকি এই সংবিধানের আওতায় সেটা করা সম্ভবও নয়। সংসদীয় গণতন্ত্র বা অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ দলতন্ত্র আজ দেশকে ভেতর থেকে টুকরো টুকরো করে দুর্বল করে চলেছে। ক্ষমতার লোভ আর অর্থের লোভ বেশীর ভাগ নেতাদের গ্রাস করেছে। এই দুর্বল জরাজীর্ণ দুর্দশাগ্রস্ত দেশের পরিবেশে বিদেশী বিধর্মী আক্রামক তত্ত্ব নিজেদের ঘাঁটী মজবুত করে চলেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে প্রত্যেক দল এই দলতন্ত্রের কাঠামোতে নিজের নিজের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার জন্য নৈতিক অনৈতিক মঙ্গল অমঙ্গল ইত্যাদি সব বিচার বিবেচনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। দেশ যাক্ গদি থাক্—এই হয়েছে বেশীর ভাগ নেতার লক্ষ্য। অতএব গণতন্ত্রের নামে এই দলতন্ত্রের প্রবঞ্চনাকে বিতাড়িত করতে হবে। যেখানে শতকরা আশি ভাগ মানুষ অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, দরিদ্র নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, ভীত, যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব, বিচারশক্তি বিবেক এবং সংস্কৃতির জাগরণের লক্ষণ নাই, উপায় নাই, সেখানে তাদের শুধুমাত্র ভোটের অধিকার নামক খুড়োর কল দেখিয়ে ছোটানো হচ্ছে, ভোলানো হচ্ছে। এ গণতন্ত্রের অধিকার নয়, এ হচ্ছে জনগণের অপমান, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা। সত্যিকার গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র ছিল রাজা দিলীপ, রঘু, দশরথ, জনক, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের রাজত্বে। এই সব আদর্শ রাজা প্রজা প্রতিপালন করতেন 'সর্বজনসুখায় সর্বজনহিতায়'।

রামায়ণে রামরাজ্যের যে বর্ণনা রয়েছে তা অপূর্ব ও বিস্ময়কর। শ্রীরামচন্দ্র সাত সমুদ্রের মেখলামণ্ডিত পৃথিবীর একমাত্র রাজা, সমগ্র বিশ্বের একমাত্র প্রভু। অথচ তাঁর কোনও অহংকার নেই, ব্যক্তিগত সুখ ঐশ্বর্য্যের লালসা নেই, সংকীর্ণ স্বার্থ নেই। তাঁর কাছে নিজের পরিজনদের চেয়েও প্রিয় হচ্ছে প্রজা। প্রজানুরঞ্জনই তাঁর প্রধান ব্রত। ত্যাগ তাঁর চরম আদর্শ। রাজধর্মের অর্থ কর্তব্য ও দায়িত্বের যথার্থ পালন, একথা রামের রাজ্যশাসনে প্রমাণিত। তাঁর রাজ্যে প্রজারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বস্তিতে বাস করে। অকাল মৃত্যু, রোগ, দারিদ্র্য ইত্যাদির কোনও স্থান সে রাজ্যে নেই। সকল নরনারী উদার, পরোপকারী, পুরুষ একপত্নীব্রতী, নারী পতিব্রতা সতীসাধ্বী। ধর্ম, সত্য, শৌচ, দয়া আর দান রূপী চার চরণ পরিপূর্ণ। কোথাও পাপের স্থান নেই। সকল মানুষ দম্ভরহিত, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যাত্মা, গুণবান ও কৃতজ্ঞ। প্রকৃতি তার নিয়মে সুষ্ঠুভাবে চলে। সত্যম্ এবং ঋতম্ যেন সর্বত্র একত্রে বিলসিত হচ্ছে। এটা একটা আদর্শ অবস্থা। সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থার চূড়ান্ত আদর্শ রূপে ধরা যায় রামরাজত্বের নিদর্শনকে।

ভারতবর্ষের রাজাকে আজ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ত্যাগ তপস্যায় আর নৈতিকতায়। স্বজনপোষণ, ক্ষুদ্র দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থে দেশের মঙ্গলকে বিসর্জন দেওয়া, গদির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গদি রাখতে দেশের ক্ষতি করা ইত্যাদি এ দেশের রাজার আচরণে বা চরিত্রে থাকবে না। দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা রাজাকে মূর্চ্ছিত করবে না। ভারতবর্ষের রাজা হবেন হিন্দুধর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিভূ। তাঁর দৈনন্দিন জীবন-চর্যায় হিন্দুত্বের আদর্শ ও নিয়মনিষ্ঠা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাজাকে দেখেই প্রজারা সদাচারের আদর্শ শিখবে।

জন্মসূত্রে রাজার ছেলেই রাজা হবেন অথবা পরিবার তন্ত্র কায়েম করতে হবে, এমন কথা কখনও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বস্তুতঃ গুণকর্মবিভাগের মূল তত্ত্ব অনুসারে রাজোচিত সর্বগুণের অধিকারী যোগ্যতম ব্যক্তিত্বই হবেন রাজা।

দীর্ঘমেয়াদী বৃহৎ কর্ম প্রকল্পগুলি রূপায়িত করার জন্য, পরিবারে ও ব্যক্তিজীবনে যথার্থ হিন্দুধর্মনিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পূর্ণাঙ্গ সুশৃঙ্খল হিন্দুসমাজ গঠন করার জন্য এবং পৃথিবীর বুকে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ আসন সুরক্ষিত করার জন্য একজন সর্বতোভাবে সামর্থ্যবান, হৃদয়বান ও নিঃস্বার্থপ্রাণ সত্যিকার হিন্দু রাষ্ট্রনেতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এবিষয়ে কিছু কথা আলোচিত হলেও একটা কথা শুধু আরও বলতে হয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতাকে হতে হবে সেই অপৌরুষেয় নিয়ামক শক্তিরই প্রতিভূরূপী ব্যক্তিত্ব। সমস্ত মানুষের অন্তরে সমবেত প্রার্থনা জাগলে, ব্যাকুল আর্তি জাগলে যুগপ্রয়োজনে সেই অপৌরুষেয় তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান নেমে আসবেন রাজা হয়ে, এতে সন্দেহ নেই।

ভক্তি, বিশ্বাস ও শুদ্ধ সংকল্প নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে হবে।

উপরে বর্ণিত বহু মহান্ কাজ সুকঠিন হলেও অসম্ভব নয়, অবাস্তব নয়। চাই শুধু আন্তরিক ইচ্ছা ও দৃঢ়সংকল্প এবং ঐ ব্যষ্টি-ইচ্ছা ও সংকল্পের একত্রীকরণ। দেশ, জাতি, ও ধর্মসংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে, অধর্মের প্রতিরোধের জন্য, এবং ভোগবাদী বস্তুবাদী আক্রমণকারী শক্তিকে প্রতিহত ও পরাভূত করার জন্য একটা দৃঢ় ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সমগ্র হিন্দুসমাজকে।

হিন্দুদের শাস্ত্র বলেছেন—'চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি। এগিয়ে

পড়, এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। যে চলে তার ভাগ্যও চলে, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে।' Expansion is life, contraction is death—বিস্তারই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু। যাত্রা যতই দীর্ঘ হোক, প্রথম পদক্ষেপেই তার শুরু। যাত্রার শুভারম্ভে বিলম্ব কিসের? সব পরিকল্পনা একদিনে নাই বা হ'ল। গন্তব্য স্থির ক'রে ঠিকপথে চলতে শুরু করলে, চলার পথেই তৈরি হয়ে যায় বাকি পথ। তিনিই ক'রে দেন। তিনিই সহায় হন। বিশ্বাস এবং ভক্তিকে মূলধন ক'রে এগোতে হবে। ভগবৎ-নির্ভরতা নিয়ে, শরণাগতি নিয়ে চলতে হবে। আকুল হয়ে তাঁর চরণে প্রার্থনা করতে হবে। শ্রীভগবান নিশ্চয়ই সহায় হবেন, শক্তি যোগাবেন, সাফল্য দেবেন, সামর্থ্য দেবেন। শ্রীমদ্ বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী বলতেন—'সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ।' শুদ্ধ সংকল্প সিদ্ধ হবেই।

অতএব সমগ্র বিশ্বের বিরাট হিন্দুসমাজের সকলে, যে যেভাবে পারে, যতটা পারে, যুক্ত হয়ে যাক্ এই মহান্ কর্মযোগে—এটাই সময়ের প্রত্যাশা এবং আমাদের প্রার্থনা। জয় ঠাকুর।

———————